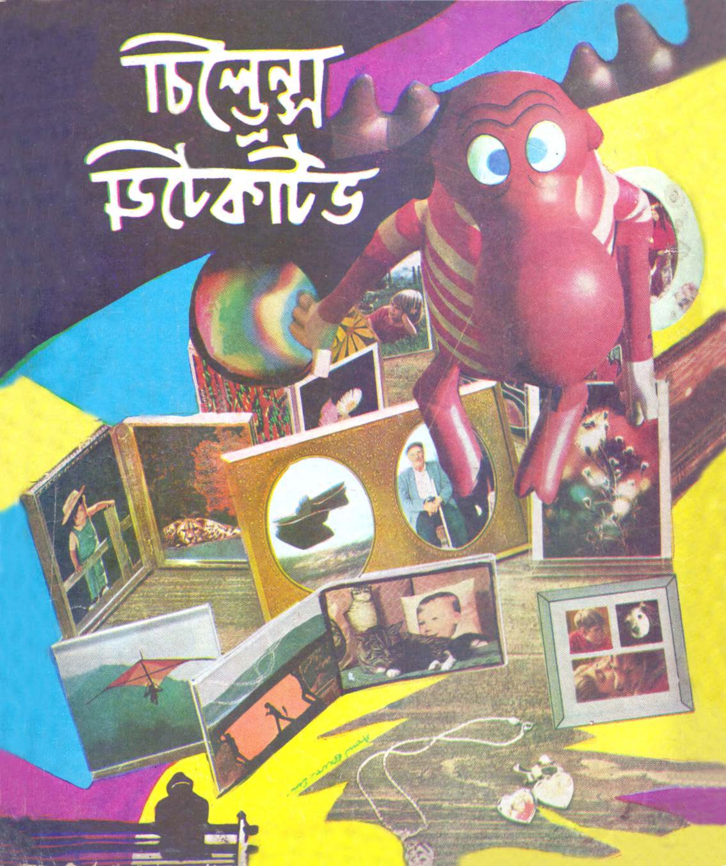
চিলড্রেন্স
ডিটেকটিভ

ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

তন্তুশ্রী তন্তুশ্রী

তাঁত বস্ত্রের
সেরা শিল্পী

তন্তুশ্রী

সঠিক দামে
সেরা গুণ মানে

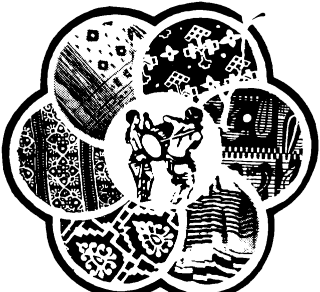

বিক্রয় কেন্দ্র : কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র, করো
(নয়াদিল্লী) এবং বাঙ্গালোর [illegible] রোড)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিঃ (পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

কলিকাতা-১৩

IPB 5080

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র
ডিসেম্বর, ১৯৮০ দাম—দুই টাকা

সূচীপত্র

১টি কমিকস উপহার
মুস্কিল আসান — জরাসন্ধ ৬০

রহস্য উপন্যাস শুরু হচ্ছে
বাদশাহী মোহর — নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কৌতুক রহস্য (বড় গল্প)
হ[illegible] উধাও রহস্য — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অ্যাডভেঞ্চারের চমকপ্রদ কাহিনী
দু'হাজার বছরব্যাপী টিটকিরি ! — অদ্রীশ বর্ধন ৫৭

ভ্রমণ কাহিনী
গ্রামের নাম লেঠেলবাড়ি — নবনীতা দেব সেন ৩৫

বাঘ শিকারের কাহিনী
কুমার বাহাদুর — জিম করবেট

আদিম অধিবাসীর রহস্যকাহিনী
ব্ল্যাক-ট্র্যাকারদের আজব কাহিনী — বীরু চট্টোপাধ্যায় ৪৯

রক্তশূন্য করে মারে ভ্যাম্পায়ার···
ভ্যাম্পায়ার — ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

রোমাঞ্চকর অলৌকিক
ছায়াবাজী — আশা দেবী

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রোমাঞ্চ-রহস্য-গোয়েন্দা,

অলৌকিক-ভৌতিক, অ্যাডভেঞ্চার

ডিসেম্বর ১৯৮০

পরীক্ষা শেষের পরের দিন ছবি	প্রতাপ চন্দ্র রায়	৪৫
আকাশ থেকে মহাকাশে বেলুন চড়ে সাগর পাড়ি	পৃথ্বীরাজ সেন	
গোয়েন্দা গল্প তিব্বতী সারসের, ডানার ঝাপটা নেই	রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫
বিজ্ঞানমনস্ক মজার গল্প কে—১০০	নিরঞ্জন সিংহ	৩৯
রোমাঞ্চকর রহস্যভেদ ক্ষুদে গোয়েন্দা	কণা বসুমিত্র	৫১
জানা অজানার কথা মনে রেখো	সোহিনী পাল	৭১
শীতে টেস্ট ক্রিকেটের কথা আবার অধিনায়ক গাভাস্কার	বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য	
লক্ষ্যভেদ তীরন্দাজ স্মিতা দত্তরায়	ডঃ মলয় পাহাড়ী	৩৭

লেখক ও পাঠকদের নিয়মাবলী

এজেন্ট হওয়ার উপায়

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ ৭৪

আমাদের কথা

ছোট ভাই বোনেরা,

'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভে'র পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় তোমাদের প্রিয় নামকরা লেখক-লেখিকাদের রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার, ভৌতিক-অলৌকিক কাহিনী ছাড়া থাকবে টারজনের অ্যাডভেঞ্চার এবং নরেন-হাঁড়ির 'পেটে খিল ধরা' হাসির কমিকস। তার সঙ্গে থাকবে 'পূজা-সংখ্যার' মতন একটি 'হেঁয়ালি' প্রতিযোগিতা এবং একটি 'অঙ্কন' প্রতিযোগিতা। আমাদের গ্রাহক, পাঠক, অনুরাগী ও সমর্থক—সবশ্রেণীর পড়ুয়াদের সংখ্যাটি পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করে রাখার জন্যে এখন হ'তেই তৎপর হতে অনুরোধ জানাই। বর্তমানে ছোটদের জন্যে যে-সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ' যাতে প্রথম সারিতে স্থান নেয়, সেজন্য আমাদের চেষ্টায় কোন ত্রুটি থাকবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই লক্ষ্য পূরণে আমরা সফল হ'ব। প্রচ্ছদপটের অলংকরণে, পত্রিকার অঙ্গসজ্জায়, বিভিন্ন গল্প-প্রবন্ধের রচনা-শৈলী ও বৈচিত্র্যে এই পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাই হবে আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি।

ইতি—
অমিতাভ সেন
প্রধান সম্পাদক

প্রচ্ছদ অলংকরণ : অমিতাভ সেন
সম্পাদক : মহীন্দ্র বসু
উপদেষ্টা : প্রণবেশ চক্রবর্তী
সারকুলেশন : রবিন মুখার্জী
যাঁরা ছাপতে আগ্রহ দেখিয়েছেন :—
প্রচ্ছদ : নিউ গয়া আর্ট প্রেস
ভিতরে ছাপা : জয়শ্রী প্রেস এবং ইম্প্রেশন
ব্লক : রয়েল হাফটোন

বিশেষ ঘোষণা

ছোট বন্ধুরা তোমাদের জন্য অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন আমরা করেছি। যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নিচের ফরমটির মতন পুরো নাম ঠিকানা দিয়ে আমাদের কাছে ৩১শে ডিসেম্বর '৮০-র মধ্যে পাঠাতে হবে।

ক্রমিক সংখ্যা (প্রশ্ন)

নাম...

ঠিকানা...

নিম্নোক্ত ঠিকানায় এনভেলাপে ভরে দিয়ে বক্তব্য লিখে পাঠাও।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ
২৬নং স্ট্রাণ্ড রোড
কলিকাতা-১

PROF. A. DASGUPTA'S

HIGHER SECONDARY

1) **Notes on English Prose (XI & XII) 1982**
2) **Notes on Eng. Poetry & Drama 1982**
3) **H. S. Eng. Suggestions 1981**
4) **Concise Eng. Composition**

ছাত্র বন্ধুগণ

ইংরেজি অর্থপুস্তক কিনতে হুঁশিয়ার। অজস্র অর্থগত ভুলভ্রান্তি বোঝা টেনে লাভ কি? লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। শুধু নামের মোহে বা হৃষ্টপুষ্ট কলেবরই অর্থপুস্তকের গুণাগুণের মাপকাঠি নয়, একমাত্র শ্রেণী শিক্ষকই তোমাদের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ হয়তো বলতে পারেন আমরা থাকতে অর্থপুস্তকের প্রয়োজন কি? এতো সত্যি কথা। তা সত্বেও নিছক প্রয়োজনে যদি কিনতেই হয় ভালো মন্দ বিচারের ভার তাদের হাতে ন্যস্ত থাকুক।

মাননীয় অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন— **Preferences, Allustions, Explanations, Questions & Answers, Wordnotes** ইত্যাদি তুলনা করে দেখলে একমাত্র Prof A DASGUPTA-ই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। আমাদের অর্থপুস্তকের পুরোভাগে সংযোজিত মাত্র কয়েকটি প্রশংসাপত্র দেখলেই বুঝতে পারবে। অধিক বলা বাহুল্য। পরীক্ষার সহায়ক Prof A Dasgugta-এর অর্থ পুস্তক দুটির শেষাংশে Council-এর মনোনীত তিন বছরের নমুনা প্রশ্নাবলীর সমাধান; অধিকন্তু নূতন Syllabus অনুযায়ী TEXT-BASED SUBSTANCE WRITING পরীক্ষায় বিশেষ সহায়ক। Text-Based Grammar প্রতিটি গল্পের শেষে প্রচুর দেওয়া আছে। অধিকন্তু Test-Paper-এর Grammar Solution-গুলিও পাওয়া যাবে আমাদের পুস্তের শেষাংশে।

অন্যান্য বই-এর সাথে তুলনা করে দেখো।

G. E. AGENCY (Publishers)

12 Bidhan Sarani, Calcutta-700006

বাদশাহী মোহর

(রহস্য উপন্যাস)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১

অতিকষ্টে পুরাতন সিন্দুকের ডালাটা খুলতেই একটা চাপ ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল আর একরাশ তেলাপোকা ফরফর করে উড়ে তার চোখে মুখে ও সর্বাঙ্গে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিপ্লব বিব্রত হয়ে ওঠে।

আকস্মিক পরিস্থিতিটা সামলাতে সে কয়েক সেকেণ্ড নেয়।

বাইরে তখন বিকেলের রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে, শীতের অপরাহ্ন।

বাতাসে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব।

ঘরের মধ্যে আলো কমে যাওয়ায় সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বিপ্লব উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের আলোর সুইচটা টিপল।

খট্ করে একটা মৃদু শব্দ হলো কিন্তু আলো জ্বললো না ঘরের।

তাকিয়ে দেখলো সিলিং থেকে আলোটা ঝুলছে ঠিকই—সুলান বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে গিয়েছে—লোড শেডিং নয়, কারণ জানলা পথে ও পাশের বাড়িতে আলোটা জ্বলছে।

কি করবে এখন বিপ্লব।

মনে পড়লো এঘরে ঢোকার সময় একটা মোমবাতি ও দেয়াশলাই সঙ্গে করে এনেছিল। সিন্দুকের পাশেই রেখেছিল। মোমবাতিটা খুঁজে পকেট থেকে দেয়াশলাইটা বের করে সেটা জ্বালাল।

ঘরের মধ্যে তখন আরো অন্ধকার চাপ বাঁধতে শুরু করেছে।

একে অনেক দিনের পুরাতন বাড়ি—দোতলা বাড়িটা বিপ্লবের ঠাকুর্দার বাবা রাজেশ্বর রায় তৈরি করে গিয়েছিলেন। সেছিল সেপাই বিদ্রোহের ঠিক পরে পরেই—১৮৫৯ সাল।

এক সাহেব কম্পানীতে রাজেশ্বর মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন—কিন্তু মানুষটা ছিল হাড় কেপ্পন। প্রাণ ধরে একটা পয়সা কখনো খরচ করতেন না। তবু কি করে যে ঐ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন সেটাই আশ্চর্য। বাড়িটা অবিশ্যি করেছিলেন তাঁর শেষ জীবনে। তাও বাড়িটা দোতালা

দোতালায় আটখানি ঘর—নীচের তলায় নয়টা ঘর—ঘরত নয় খুপড়ি বলাই-বোধ করি ভাল।

সর্বদা পরে থাকতেন একটা আট হাত ধুতি ও একটা ফুলহাতা বেনিয়ান—শীত গ্রীষ্মে ঐ একটি বেনিয়ান। তবে খুব বেশী কনকনে শীত পড়লে একটা মটকার চাদর গায়ে জড়াতেন।

রাজেশ্বর রায় যেমন দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিলেন তেমনি গায়ের রংটা ছিল সাহেবদের মত টক টকে গৌর বর্ণ। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

তার একমাত্র পুত্র বা বংশধর যজ্ঞেশ্বর—তাকে লেখাপড়া সামান্য করিয়ে ছিলেন রাজেশ্বর। সাহেব কম্পানীর দালালী করতেন তিনি।

প্রায় নব্বুই বৎসর বয়সে যখন রাজেশ্বরের মৃত্যু হলো যজ্ঞেশ্বরের বয়স তখন ষাটের উর্ধে।

বাপের মৃত্যুর পর মার মুখে শুনলেন যজ্ঞেশ্বর তার বাবা প্রভূত অর্থ রেখে গিয়েছেন বটে-তবে কোথায় সঞ্চিত আছে সে অর্থ তা তিনি জানেন না।

ছেলে শুধিয়েছিল, জান না মা।

না বাবা। জানি না।

বাবার যে অনেক টাকা ছিল কথাটা কেমন করে তুমি তাহলে জানতে পারলে?

মা প্রথমটায় বলতে চাননি।

পরে অনেক পিড়াপিড়ি করায় বলেছিলেন। এক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় একটা দৃশ্য তিনি দেখেন—ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে.......

টিম টিমে প্রদীপের আলো।

সেই আলোয় দেখতে পান এক অদ্ভুত দৃশ্য।

অদূরে শয্যায় বসে ঝকঝকে বাদশাহী মোহর একটা একটা করে গুনে তিনি একটা পিতলের হাঁড়ির মধ্যে সন্তর্পণে রাখছেন।

সেগুলো যে মোহর তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

বুঝেছিলেন পরের দিন ঘরের কোণে একটা সোনার বাদশাহী মোহর কুড়িয়ে পেয়ে।

মোহরটা সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বরের মা ভুবন মোহিনী দেবী, তাঁর তোরঙ্গের মধ্যে। সেটা এনে ছেলের হাতে তুলে দেন। বাদশাহী সোনার মোহরই সত্যি সত্যি একটা।

তারপর ছেলে আর ছেলের মা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় মোহরের কোন সন্ধান কেউ পায় নি।

বলতে গেলে যজ্ঞেশ্বর সারাটা জীবনই যতদিন বেঁচে ছিলেন 'পিতার গুপ্তধনের সন্ধান করেছেন কিন্তু কোন হদিশ পাননি তার।

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বর—বিপ্লবের বাবা।

তিনিও বাদ যান নি।

অনেক ছুটির দিনে দীর্ঘ দ্বিপ্রহর ও অনেক বিনিদ্র রজনী সেই গুপ্তধনের সন্ধান করেছেন।

কিন্তু তাঁকেও হতাশ হতে হয়েছে।

বয়স তখন তার কতই বা হবে।

ত্রিশ বত্রিশ—

বিপ্লবের বয়স তখন দুই মাত্র।

একেবারে শিশু।

সবে চলতে শিখেছে।

বিপ্লবের মা রত্না দেবী প্রখর বুদ্ধিমতী নারী—তিনিই অনেক বুঝিয়ে তার স্বামীকে ঐ সোনার হরিণের খোঁজ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

সোমেশ্বর বি. এ. পাশ, শিক্ষিত—মোটামুটি একটা ভালই চাকরি করত।

সংসারে কোন অভাব ছিল না। এবং সোনার মোহরের কথা ভুলেও গিয়েছিল।

বিপ্লবের যখন বছর তের চোদ্দ বয়স ক্লাশ নাইনের ছাত্র সে সময় হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটলো।

সামনে পরীক্ষা—

দ্বিপ্রহরে একাকী নীচের তলায় একটি ঘরে বসে পড়ছিল।

হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব।

শুন বেটা—

কেটে পড় বাবা, বিপ্লব বললে, এখানে কোন সুবিধা হবে না।

শোনই না।

কি শুনবো।

আমি তোমার কাছে কোন ভিখ্ মাংছি না।

তবে কি চাও।

একটা কথা বলতে এসেছি—

কি কথা।

এই কোঠির মধ্যে বহু বাদশাহী সোনার মোহর লুকানো আছে। এই কোঠি বিক্রি করিস না বেটা।

বিপ্লব চমকে ওঠে।

কারণ কথাটা গল্পের ছলে মা তাকে একদিন বলেছিলেন—রাজেশ্বরের গুপ্তধনের কথা।

বিপ্লব বললে, কি করে জানলে তুমি

জানি।

(১০ পাতায় দেখুন)

আমাদের কথা

ছোট ভাই বোনেরা,

'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভে'র পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় তোমাদের প্রিয় নামকরা লেখক-লেখিকাদের রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার, ভৌতিক-অলৌকিক কাহিনী ছাড়া থাকবে টারজনের অ্যাডভেঞ্চার এবং লরেল-হার্ডির 'পেটে খিল ধরা' হাসির কমিকস। তার সঙ্গে থাকবে 'পূজা-সংখ্যার' মতন একটি 'হেঁয়ালি' প্রতিযোগিতা এবং একটি 'অঙ্কন' প্রতিযোগিতা। আমাদের গ্রাহক, পাঠক, অনুরাগী ও সমর্থক—সবশ্রেণীর পড়ুয়াদের সংখ্যাটি পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করে রাখার জন্যে এখন হ'তেই তৎপর হতে অনুরোধ জানাই।

বর্তমানে ছোটদের জন্যে যে-সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ' যাতে প্রথম সারিতে স্থান নেয়, সেজন্য আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই লক্ষ্য পূরণে আমরা সফল হ'ব। প্রচ্ছদপটের অলংকরণে, পত্রিকার অঙ্গসজ্জায়, বিভিন্ন গল্প-প্রবন্ধের রচনা-শৈলী ও বৈচিত্র্যে এই পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাই হবে আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি।

ইতি—

অমিতাভ সেন

প্রধান সম্পাদক

প্রচ্ছদ অলংকরণ : অমিতাভ সেন

সম্পাদক : মহীন্দ্র বসু

উপদেষ্টা : প্রণবেশ চক্রবর্তী

সারকুলেশন : রবিন মুখার্জী

যাঁরা ছাপতে আগ্রহ দেখিয়েছেন :—

প্রচ্ছদ : নিউ গয়া আর্ট প্রেস

ভিতরে ছাপা : জয়শ্রী প্রেস এবং ইম্প্রেশন

ব্লক : রয়েল হাফটোন

বিশেষ ঘোষণা

ছোট বন্ধুরা তোমাদের জন্য অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন আমরা করেছি। যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নিচের ফরমটির মতন পুরো নাম ঠিকানা দিয়ে আমাদের কাছে ৩১শে ডিসেম্বর '৮০-র মধ্যে পাঠাতে হবে।

ক্রমিক সংখ্যা (প্রশ্ন)

নাম............ ....

ঠিকানা ....

নিম্নোক্ত ঠিকানায় এনভেলাপে ভরে দিয়ে বক্তব্য লিখে পাঠাও।

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

৪৬নং স্ট্রাণ্ড রোড

কলিকাতা-১

ছায়াবাজী

—আশা দেবী

আজ সাতদিন হলো দারুণ ঝড় বিষ্টি চলেছে। পথ ঘাট জলে থৈ-থৈ। বাড়ি থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই। বারটা ছিল শনিবার। টেলিভিসনে সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" হবে।

আর রক্ষে আছে? সন্ধ্যে হতে না হতে ছেলে বুড়োর ভীড় লেগে গেল বাড়িতে। আমি একাই থাকি বাড়িতে —তাই চোর জুয়াচোর পকেটমার সম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক। সুতরাং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নামবার আগেই চারদিকের দরজা জানালা বন্ধ করেছি। বাইরের দরজায় এঁটে পিঠে তালা লাগিয়ে দি।

কিন্তু আজ আর সেটা সম্ভব হল না। পিঁপড়ের সারের মত ছেলে বুড়োর ভীড়ে বিব্রত হয়ে পড়লাম। কারুকে আসতে বারণ করতেও সঙ্কোচ হয়—পাড়ার লোক। কিন্তু উৎপাত-এর রেটটা বড়ই বেশী। এই একজন আসছে তো আর একজন যাচ্ছে।

কিন্তু ছবি শুরু হলো। ওপর নীরব। পাম্পে জল নেই আমি নিচে এসে পাম্প খুলে দিতেই নিচের সব আলো ফিউজ হয়ে গেল। আলো আঁধারীতে যেন আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল।

হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো এক বলিষ্ঠ দেহ দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি চমকে উঠলাম। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো যেন। গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়তে লাগলো। দরজার দিকে তাকালাম। না—, দরজা বন্ধই আছে। তবে লোকটা এলো কি করে?

আমি বললাম কে?

লোকটি নীরব।

: কে তুমি?

কোন সাড়া নেই।—

আমি পালাই সেও আমাকে ধাওয়া করে।

: কে—কে? আমি পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু ছবির আকর্ষণ এমনই যে ঘর ভরা লোক কেউ-ই আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না। আমি এবার পাগলের মত বারান্দায় ছুটোছুটি করতে লাগলাম। আর বাঁচতে পারবো না। লোকটা এবার আমার নিশ্চয়ই গলা টিপে ধরবে।—

অনেক দিন আগের কথা। শুনেছিলাম কার যেন মুখে গল্পটা। একটা বেড়ালকে দুটি ছেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দারুণভাবে প্রহার করছিল। পোষা বেড়াল। সে মোটেই হিংস্র নয়। তবু প্রাণের দায়ে মরিয়া হয়ে নাকি যে মারছিল সেই ছেলেটার টুঁটি টিপে বেড়ালটা মেরে ফেলে। যখন অন্য ছেলেটি মরা বেড়ালটাকে ওর গলা থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করলো, তখন সে ব্যর্থ হলো। বেড়ালটা ছেলেটাকে মরণ কামড় দিয়ে ধরেছিল।

আমারও সেই অবস্থা। আমি জানি এবার আমাকে মরতেই হবে সুতরাং হাতের কাছে একটা বাটি ছিল সেটা দিয়ে প্রাণপণে লোকটাকে জখম করতে গিয়ে হাতের অসাবধানে নাড়া লেগে বারান্দায় একটা বাতি জ্বলে উঠলো।

আশ্চর্য লোকটা তো আর নেই। তবে কী ওটা আমারই ছায়া? আমি কী তা হলে আমার ছায়াকে ভয় করি। নিজের মনের কাছে বার বার বিস্মিত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।

বাদশাহী মোহর

(৮ম পাতার পর)

কোথায় আছে—

আছে।

কোথায়।

সে আমি বলবো না। রেখে খোঁজ।

সন্ন্যাসী কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায় না চলে যায়।

বিপ্লব ডাকে, ও সন্ন্যাসী ঠাকুর, শোন, শোন

কিন্তু সন্ন্যাসী তার কথায় কর্ণপাত করে না। সে তখন হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর চলে গিয়েছে।

বিপ্লব ঘর থেকে বের হয়ে সন্ন্যাসীর খোঁজে ছোটে—কিন্তু তার দেখা পায় না।

ঘটনাটা ঘটেছিল দিন পনের আগে।

ঐ ঘটনার কিছু দিন আগেই বিপ্লবের বাবা সোমেশ্বর রায়ের মৃত্যু হয়েছিল।

সংসারে এখন বিপ্লব ও তার মা—আর এক পুরাতন ভৃত্য সাধুচরণ।

সোমেশ্বর যা রেখে গিয়েছিল, তাতে করে মা ও ছেলের অভাব হবার কথা নয়। হয়ও নি অভাব।

আর একটি ঘটনা ঘটলো ইতিমধ্যে—

এক ধনী ভদ্রলোক বিপ্লবদের বাড়িটা ও ঐ সংগে আশে পাশের দু'তিনখানা বাড়ি কিনতে চায়।

ভদ্রলোকের নাম রাধাশ্যাম দত্ত।

সব বাড়িগুলো কিনে—ভেঙ্গে সেই জায়গায় একটা মাল্টি-স্টোরিড বাড়ি তিনি করবেন।

বিপ্লবের মা দো মনা করেন, কারণ টাকার অঙ্কটা বেশ মোটাই ছিল।

তৃতীয় ঘটনা ঘটলো সন্ন্যাসী আসার মাত্র দু'দিন আগে।

হঠাৎ একটা চিঠি—এক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তির কাছ থেকে।

চিঠিতে লেখা—

রত্না দেবী, আপনার বাড়িটা আমি ক্রয় করিতে চাই—সত্তর হাজার টাকা দিয়ে, সম্মত থাকিলে—উপরের টেলিফোন নাম্বারে ফোন করিবেন বা ঐ ঠিকানায় পত্র দিবেন—রামকিংকর শেঠ।

রত্না দেবী রীতিমত ভাবিত হলেন।

তারপর ঐ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব।

বিপ্লব মাকে সব কথা—মানে সন্ন্যাসীর কথা বললে।

[ক্রমশঃ]

আগামী সংখ্যায় অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা নিয়ে 'বাদশাহী মোহর' তোমাদের মন জয় করবে।

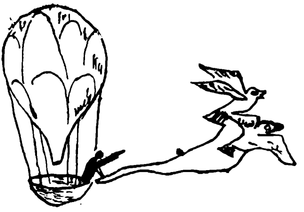

মাটির মানুষ কেমন করে পাড়ি দিলো মহাকাশে তারই রোমাঞ্চ জাগানো সার্বিক কাহিনী "আকাশ, থেকে মহাকাশে" এই সংখ্যা থেকে শুরু হলো। তোমাদের জন্যে এটি লিখেছেন পৃথ্বীরাজ সেন।

বেলুন চড়ে সাগর পাড়ি

পৃথ্বীরাজ সেন

চারিদিকে অনন্ত অথৈ জলের কল্লোল! যতো দূর চোখ যায় শুধু নীল জলরাশি। সামনে কোথাও নেই এতটুকু মাটি, দিগন্ত রেখা বুঝি মিশেছে সাগরের সাথে।

এর নাম প্রশান্ত মহাসাগর। আয়তনে সবার বড়ো, স্বভাবে সবচেয়ে শয়তান। কখন যে তার বুকে ঘটবে বিস্ফোরণ কে জানে।

হয়তো অতিকায় দৈত্যের মতো ছুটে আসবে জলপ্রপাত, ঘুমন্ত কোন আগ্নেয়গিরির ব্যর্থ আক্রোশ আছড়ে পড়বে মহাসমুদ্রে! এই বিশাল মহাসমুদ্রে মুখ থুবড়ে পড়ে শক্তিশালী জাহাজ, পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিনও হারিয়ে যায় কোন অতলে!

অথচ প্রশান্তর বুকে আজ বেলুন যাত্রার আয়োজন চলেছে! কি? খবরটা শুনে তোমরা কি চমকে উঠলে নাকি? খবরের কাগজের পাতায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আর পৌঁছে গেছে সারা পৃথিবীতে!

ব্যাপারটা তাহলে আরেকটু বিশদভাবে বলা যাক।

অনেকদিন আগে থর হেইরডাল নামে এক অতীব সাহসী অভিযাত্রী ভিডি নৌকো বেয়ে দুরন্ত আটলান্টিক সাগর পার হন। তাঁর সেই স্বপ্নের জলযানের নাম ছিল কনটিকি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ যুগের দুই অভিযাত্রী বছর দুই আগে বেলুনে চড়ে আটলান্টিক পার হয়েছিলেন।

এ যুগের সেই দুই অভিযাত্রীর নাম—বেন আবরুজ্জো আর ল্যারি নিউজম্যান।

তাঁদের তৈরী বেলুনটির নাম হল "যুগল ঈগল ১১"।

আটাত্তর সালের এই সফল অভিযানের পর আবরুজ্জো আর নিউজম্যান এখন প্রশান্ত পাড়ি দেবার স্বপ্নে বিভোর। প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী এপ্রিলে তারা এই দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করবেন।

জাপানের রাজধানী টোকিও শহর থেকে শুরু হবে রোমাঞ্চকর অভিযান। প্রশান্ত পার হয়ে তাঁরা পৌঁছবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া শহরে। পথের দূরত্ব হবে ১৯ হাজার কিলোমিটার!

এই দুরন্ত অভিযানে বেন-ল্যারির দুই সঙ্গী থাকছেন।

এঁদের একজনের নাম রন ক্লার্ক। মার্কিন দেশের এই ভদ্রলোক সারাজীবন কাটিয়েছেন বেলুনের গবেষণায়।

চতুর্থ সঙ্গী জাপানী ব্যবসায়ী রকি আওকি। ইনি হোটেলের ব্যবসা করে থাকেন।

রহস্যময় এই অ্যাডভেঞ্চারের প্রধান নায়ক হলেন বেন আবরুজ্জো।

এই প্রথম বেলুন চড়ে প্রশান্ত পাড়ি দেবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু অনন্ত নীল আকাশ সভ্যতার প্রথম প্রহর থেকেই মানুষকে হাত ইশারা করেছে।

সেই ফেলে আসা দিনে বিস্মিত মানুষের চোখের তারায় আঁকা হয়েছে নীল আকাশের উড়ন্ত বিহঙ্গের নানা ছবি। সেদিনের বিস্মিত মানুষ কল্পনা করেছে আকাশ জয়ের নানা রোমাঞ্চকর অভিযান।

কৌতূহল-ই মানুষকে আজ সমস্ত বসুন্ধরার সম্রাট করেছে। এই আকাঙ্ক্ষাই তার মনে রোপণ করে আকাশ জয়ের কল্পনা।

এই কল্পনা প্রকাশিত হয় রূপকথায়, পুরাণ গাথায়। গ্রীসের মানুষ কল্পনা করে আকাশ জয়ী দেবতা মার্কারিকে। যিনি সপ্তদুটি ডানায় ভর দিয়ে উড়ে গেছেন আলোকিত সূর্যের দেশে।

শুধু গ্রীসেই নয়, ভারত, মিশর, সিরিয়া অথবা চীনে এমন আকাশজয়ী দেবতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

কল্প-কথা থাক। এসো, আমরা বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করি।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বিখ্যাত ইতালীয় মনীষী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে লিওনার্দো অসাধারণ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তাঁর শিল্পী মানসিকতার অন্তরালে লুকিয়ে ছিল চির অনুসন্ধিৎসু শত-সহস্র জিজ্ঞাসা।

তিনি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও আবিষ্কর্তা।

ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে ক্যানভাসে ইজেলের বিমূর্ত টানের অবকাশে লিওনার্দোর স্বপ্নাতুর দুটি আঁখি কখন হঠাৎ মুক্ত বিহগের সঙ্গী হয়ে অলকাপুরীর অলক মেঘে বিচরণ করতো কে জানে।

পাখীদের সাথে মিতালী পাতিয়ে তিনি জেনে নেন তাদের ওড়ার কৌশল। কেমন ভাবে তারা ছোট্ট দুটি ডানায় ভাসিয়ে রাখে দেহ, কেমন ভাবে দূর আশমানে ঘুর পাক খায়, যেন আকাশের বুক থেকে খসে পড়ে দুষ্টু তারা।

শুধু তাই নয়। বাতাস সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জেনে নিলেন তিনি। কেন ঝড় ওঠে ; ঘূর্ণি আসে, হঠাৎ সমুদ্র হয় উত্তাল, এর অন্তরালে বাতাস-বুড়ীর কোন কারিকুরি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে লিওনার্দো অবশেষে তৈরি করলেন ডানা ঝাপটানো বিচিত্র এক যন্ত্র। তাঁর বড় শখ ছিল এ যন্ত্র একদিন ভেসে যাবে সুদূর মেঘের মিনারে। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

নকল ডানা লাগিয়ে মানুষ যেমন আকাশের বুকে ভেসে থাকতে পারে না, কেননা, তার নেই পাখীর মত মাংসপেশী, ঠিক তেমন ভাবেই ডানা-ঝাপটানো যন্ত্র মানুষকে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না।

লিওনার্দোর স্বপ্ন সফল হলো না সত্যি। কিন্তু তিনি বাতায়নের পথটি উন্মুক্ত করে দূর আকাশের বুকে জমে

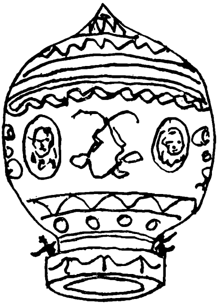

থাকা রোমাঞ্চ আর রহস্যকে ছিনিয়ে আনলেন। তিনি হলেন এই প্রচেষ্টার প্রথম নায়ক।

এরপর মানুষ আর একটু উন্নত হলো। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীর আরেক বিজ্ঞানী ফ্রানসিসকো ডিলানা বাতাস নিয়ে মেতে উঠলেন নানা গবেষণায়। তিনি জানতেন বাতাসের ওজন আছে। তাই বাতাসে পাখীর মত ভাসতে হলে প্রয়োজন হালকা কোন বস্তু। যেমন ছিপি ভাসে জলে অথচ একটুকরো লোহা টুপ করে ডুবে যায়।

ডিলানা যে উড়োজাহাজের পরিকল্পনা করেন সেটা অনেকটা পালতোলা নৌকার মত দেখতে।

(পরের অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়)

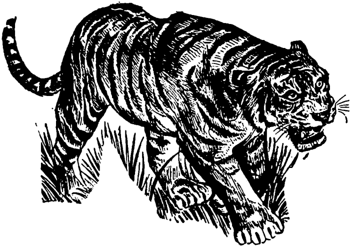

কুমারবাহাদুর / জিম করবেট

[শিকারীদের মধ্যে প্রবাদপুরুষ জিম করবেট। ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য বনাঞ্চলে অসমসাহসী অদ্ভুতকর্মা এই শিকারী বত্রিশ বছর ধরে অনবরত মানুষখেকোর পেছনে ধাওয়া করেছেন—বহু অঞ্চলের লোকদের ব্যাঘ্র-ভীতির নিরসন করেছেন। প্রকৃতির বিচিত্র ইশারা তাঁর শিকারের সময় উপায় বাতলে দিত। এই প্রকৃতির ইশারা ও পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁর শিকারের কাহিনীগুলিকে মনোরম সাহিত্যের পর্যায়ে এনে দিয়েছে।]

ভাষান্তর : পূর্ণেন্দু

সারা যুক্তপ্রদেশে 'পাওয়ালগড়ের কুমারবাহাদুর' বলে বাঘটা পরিচিত ছিল। উনিশ-শো-বিশ থেকে ত্রিশ সাল পর্যন্ত 'কুমারবাহাদুর'কে মেরে নাম কেনবার জন্যে বহু শিকারী হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। টোপ হিসেবে মোষ ব্যবহার করে বহুবার বাঘটাকে ঘায়েল করার চেষ্টা হয়েছে। যতদূর জানা যায় আগে মাত্র দুবার হাত কয়েক তফাতে বাঘটাকে দেখার সৌভাগ্য দুজন নামকরা শিকারীর হয়েছিল—এবং এই দুবারই বাঘটি একচুলের জন্যে বেঁচে গিয়েছিল। প্রথমবার ভালো বীট দেওয়ার চরম মুহূর্তে বাঘটাকে সামনে পেয়েও তাকে গুলি করতে পারেননি শিকারী ফ্রেড অ্যাণ্ডার্সন—মাচানের দড়িতে তাঁর রাইফেল বেধে যায়। দ্বিতীয়বার বীট আরম্ভ হওয়ার আগেই বাঘটা মাচানের সামনে এসে হাজির হয়। শিকারী হুইশ এডি প্রস্তুত ছিলেন না—নিবিষ্ট মনে তাঁর পাইপে তামাক ভরছিলেন। বাঘটার আকৃতি সম্বন্ধে অ্যাণ্ডার্সন বলেছেন—কোটল্যাণ্ড জাতের টাট্টু ঘোড়ার মতন। এডি'র মতে বাঘটার আকৃতি গাধার মতন।

পাওয়ালগড়ে জিম করবেটের শীতাবাস থেকে তিন মাইল দূরে গভীর বন। তার মধ্যস্থলে প্রায় চারশো গজ লম্বা আর দুশো গজ চওড়া ঘাসে-ছাওয়া একটা ফাঁকা জমি। এইখানেই কুমারবাহাদুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত, অবশ্য দূর থেকে।

শীতের এক সকালে সবে সূর্য উঠেছে। জিম করবেট মাঠের ওপারের উঁচু জমি পার হয়ে নীচে নেমে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সিগারেট টানছেন। ঝরনার ধারে কতকগুলো লাল-রঙের বনমুরগী। শিশির ভেজা ঘাসের ওপর পঞ্চাশটারও বেশী চিতল চরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সবচেয়ে কাছের হরিণটা করবেটের দিকে ফিরে ডেকে উঠল। এটা বাঘের উপস্থিতি সম্পর্কে বন্য জন্তুদের স্বভাবসিদ্ধ হুঁশিয়ারি! তারপরই ঘন ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং 'কুমারবাহাদুর'। এক মিনিট ধরে ঘাড় উঁচু করে সে চারিদিক দেখে নিল, তারপর গদাইলস্করী চালে মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে চলল। হরিণের দল সভয়ে দুপাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে ঝরনার কাছে গিয়ে গা এলিয়ে দিয়ে 'কুমারবাহাদুর' জল খেল।

তারপর এক লাফে ওপারে গিয়ে উঠল। খোলা জায়গায় বাঘটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বন্য জন্তুদের ঐক্যতান শুরু হল—হরিণের ডাক, বনমোরগের চিৎকার, গেছো বাঁদরদের কিচিরমিচির শব্দে এক সোরগোল উঠল। ব্যাঘ্রপুঙ্গব অরণ্যবাসীদের এই ভয়ার্ত অভ্যর্থনার জবাবে তিনবার গর্জন করে ওপারের ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেল।

শিকারীদের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আত্মরক্ষার তাগিদেই 'কুমার বাহাদুর' যে আস্তানা বেছে নিয়েছিল, তার তারিফ করতে হয়। কুমার বাহাদুরের সাবেক আস্তানাটা ছিল বিরাট বিরাট গাছে ঢাকা। ১৯৩০ সালে বন-বিভাগ গাছ কেটে 'জঙ্গল' সাফ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে, ফলে কুমারবাহাদুরের 'নিরাপত্তা' বিঘ্নিত হয়। কাজেই ব্যাঘ্রপুঙ্গব সেখান থেকে পাত-তাড়ি গুটিয়ে সরে গেল ছ' মাইল দূরে একটি খাদে।

এই অঞ্চলে অধিকাংশ বাঘই ধরা হয় হাতির সাহায্যে। আস্তানা নির্বাচনে এখানেই কুমার বাহাদুরের 'দূরদর্শিতার' পরিচয় পাওয়া যায়। খাদটা লম্বায় আট মাইল। দুধারে সারি সারি হাজার ফুট খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গুহা। এই গুহাগুলিই ছিল বাঘের আড্ডা। ওপর দিকে প্রায় বিশ ফুট উঁচু একটা ঝরনা। নীচের দিকে জল যেখানে লাল মাটির ওপরে এসে পড়েছে, সেখানে ঝরনাটা সরু হয়ে চার ফুটে এসে ঠেকেছে। এখানে হাতি অচল। কাজেই কুমারবাহাদুরকে নিজের আস্তানায় মারতে হলে শিকারীর পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা ছিল না। তার ওপর রাত্রে শিকার করার বিরুদ্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল। দুর্গম আস্তানা, সরকারী নিষেধাজ্ঞা সবই ছিল কুমারবাহাদুরের অনুকূলে। তাই শিকারীদের 'কলা দেখিয়ে' কুমারবাহাদুর বহুদিন বহাল তবিয়তে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন। সেবার সারাটা শীত দলের পর দল শিকারীরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু কুমারবাহাদুরের টিকিও কেউ দেখতে পায়নি।

একদিন এক বুড়ো রানার (ডাক-হরকরা) করবেটকে বলে, সেদিন সকালে রাস্তায় সে এক প্রকাণ্ড বাঘের থাবার ছাপ দেখেছে—তার তিরিশ বছর চাকরি-জীবনে সে এতো বড় থাবার ছাপ দেখেনি।

রানারের কাছ থেকে জায়গাটার সঠিক হদিশ নিয়ে, করবেট তার পরদিন তাঁর শিকারী কুকুর রবিনকে নিয়ে কুমারবাহাদুরের খোঁজখবর নিতে বেরোলেন। রবিন মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলেছে। বেশ কিছুটা পথ যাবার পর নরম মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা গেল। করবেট বুঝলেন তাঁরা কুমারবাহাদুরের পেছন-পেছন চলেছেন, শীগগির তার নাগাল পাবেন।

প্রায় চারশো হাত পথ যাবার পর প্রায় আশি হাত চওড়া এক ক্লোরোডেনড্রনের ঝোপের কাছে এসে রবিন থমকে দাঁড়ালো। ঝোপের মধ্যে নজর চলে না। রবিনকে তুলে ধরেন করবেট। ওর পিছনের পা দুটো তাঁর বাঁদিকের পকেটে, তার সামনের পা দুটো দিয়ে করবেটের কাঁধ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। করবেটের হাত দুটো খালি, দরকার মতন বন্দুক ধরতে পারবেন। ক্লোরোডেনড্রনের ভেতরে অর্ধেকটা যাবার পর সামনের ঝোপটা নড়ে উঠলো। করবেট নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন, ফাঁকা জায়গায় বাঘটা বেরিয়ে আসার আশায়। কিন্তু নাঃ, বাঘটা কাছাকাছি একটা খাদে গা ঢাকা দিয়েছে। বাঘের সঙ্গে সামনা সামনি লড়াইয়ের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেই, প্রাতরাশেরও সময় হয়ে এসেছে। রবিনকে নিয়ে করবেট বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

চা পানের পর একটা চারশো-পঞ্চাশ পয়েন্টের ভারি রাইফেল নিয়ে করবেট একাই ফিরে গেলেন। পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই মোষের গলার ঘণ্টার আওয়াজ আর সেই সঙ্গে একটা লোকের আর্ত চিৎকার কানে এলো। পাহাড়ের ওপর উঠে করবেট দেখলেন একটা লোক গাছে চড়ে বসে আছে, আর কুড়ুলের মাথা দিয়ে একটা মরা ডালের ওপর ঘা দিয়ে চিৎকার করছে। গাছের নীচে কতকগুলো মোষ দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাদের মুখ বাইরের দিকে। করবেটকে দেখেই লোকটা বলে ওঠে, উটের মতন প্রকাণ্ড একটা বাঘ তার আর মোষগুলোর পিছনে লেগেছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে জ্বালাচ্ছে।

(পরের অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

"তিব্বতী সারসের ডানার ঝাপটা নেই"

রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনটা ছিল অগস্টের মাঝামাঝি। মঙ্গলবার। পূর্ব পরিকল্পিত সূচী অনুযায়ী ভোর চারটে আঠারোর ফ্লাইট ধরে পালাম পৌছে দেখতে পেলাম ডক্টর জাহাঙ্গীর খান সান্তাক্রুজ থেকে পৌছে গেছেন। আমরা শ্রীনগরে পৌছে খবর পেলাম যে চণ্ডীগড় থেকে ডিরেক্ট ফ্লাইটে লে'তে পৌছে গেছে দলের বাকী সভ্যরা। বলা বাহুল্য যে কৃষ্ণকণ্ঠ তিব্বতী সারস খুঁজতে যাওয়ার পিছনে ছিল যে উদ্দেশ্য, সেটা সংক্ষেপে তোমাকে আগেই বলেছি। বাক্যটা মাঝপথে চাপা পড়ে গেল কাশির ধমকে। আচমকা অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে কয়েক মুহূর্তের জন্ত থামতে হলো।

'কিন্তু স্যার আমি এর মধ্যে কি ভাবে আসছি। ইতস্ততঃভাবে শুভেন্দুশেখর সাহা জানালো। নিভে যাওয়া সিগারটা ধরাতে ধরাতে হাত তুলে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তাকে। আয়েস করে সিগারে টান দিয়ে, রিভলভিং চেয়ারটার পিছনের দিকে হেলে পড়ে সিলিং দেখতে দেখতে চীফ বললেন থলি থেকে বেড়ালটা বের করার জন্ত তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি।

পুরো একটা গোটা মিনিট শুভেন্দু তাকিয়ে রইল টেবিলে রাখা ফাইলটার উপর, আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, সামনে ঝুঁকে অভিবাদন করে বেরিয়ে চলে এলো।

শুভেন্দু বের হয়ে যেতেই, চীফ পাশে রাখা পঞ্চম টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, হ্যালো, আমি হাই আলটিটিউডের ফাইলটা শুভেন্দুকে দিয়েছি। তুমি ওর সঙ্গে বসে ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফয়সালা করে ফেল। রিসিভারটা নাবিয়ে রাখতেই নজরে পড়ল কফির ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে ইশা থিবো। চোখের ইশারায় বসতে বলে, প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন ইশার দিকে, সেই ছোকরা কি বলে, মুখার্জী এখন কোথায় ? কফির পেয়ালায় চিনি মেশাতে, চামচটা তুলে নিয়ে, ইশা পাল্টা প্রশ্ন করল, কে ? তাকে আবার কেন ? ছোট্ট চুমুক দিয়ে পেয়ালাটি টেবিলের উপর রেখে বললেন, এখনি দরকার ওকে।

নিবিষ্টমনে তন্ময় হয়ে রিপোর্টটা পড়ছিল শুভেন্দু।

(পরের অংশ ১৯ পৃষ্ঠায়)

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পাতলা তামার তৈরী চারটি বায়ুশূন্য গোলকের সাহায্যে এটিকে ভাসিয়ে রাখার পরিকল্পনা করা হয়। ডিনালার কল্পনার উড়োজাহাজ কোনদিনই তৈরী হয়নি। তবু আকাশ জয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল আরো একশো বছর! এবার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন দুই ফরাসী ভদ্রলোক—মণ্টো গফলার নামে দুই ভাই। তাঁদের গবেষণা ছিল, কিভাবে আকাশে মেঘের মত ভেসে বেড়ানো যায়—তাই নিয়ে।

কোন এক কনকনে শীতের রাতে, সমস্ত ফরাসী দেশ যখন ঝুরুঝুরু তুষারের হিমআবরণে ঢেকেছে মুখ, তখন অতি সাহসী দুভাই ঘরের কোণে বসে আগুনের ওপর উঠে আসা ধোঁয়া লক্ষ্য করতে করতে ভাবলেন যে একটি ব্যাগে যদি ধোঁয়া ভর্তি করা হয়, তবে সেটা নিশ্চয়ই ওপর দিকে উঠে যাবে। প্রথমে এক ছোট সিল্কের ব্যাগে পরীক্ষা করা হলো। তারপর দুভাই বড়বড় ব্যাগের সাহায্যে অনেক পরীক্ষা চালালেন।

বলা যেতে পারে, এঁরাই হলেন বেলুনের আবিষ্কর্তা।

এঁরা জানতেন, গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা। তাই বাতাস যতক্ষণ গরম থাকে, ততক্ষণ বেলুন আকাশের বুকে ভাসবে। কিন্তু বেলুনের ভেতরকার বাতাস ঠাণ্ডা হলেই সেটি মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়বে মাটিতে।

আরো পরীক্ষা চললো।

অবশেষে মানুষ হঠাৎ একদিন খুঁজে পেল আকাশের ঠিকানা।

১৭৮৩ সালের ২১শে নভেম্বর।

দিনটি আমাদের আকাশ জয়ের ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা আছে। এইদিন দুই অভিযাত্রী—পিলত্রে দা রেজিয়ার ও মার্কুইস ড আরলানদিস গ্যাস বেলুন চড়ে আকাশ পাড়ি দিলেন।

এই প্রথম বেলুন ২৫ মিনিটে সাড়ে পাঁচ মাইল ভ্রমণ করে নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে আসে।

এর কিছুদিন বাদে ফরাসী দেশেই আবিষ্কৃত হলো হাইড্রোজেন বেলুন। মানুষ ইচ্ছেমত বেলুন চড়ে মেঘের মত ভেসে চললো। কিন্তু বেলুনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত

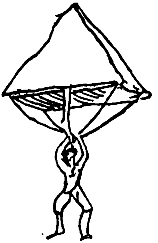

করার কোন কৌশল তাদের জানা ছিল না। তাই উড়তে উড়তে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হতো।

১৮৫২ সালে হেনরী গিভার্ট নামে এক ফরাসী এঞ্জিনিয়ার প্রথম এক নিয়ন্ত্রিত বেলুন আবিষ্কার করে সকলকে অবাক করে দিলেন।

এই বেলুনটি লম্বায় ছিল ১৪৩ ফুট, দেখতে যেন চুরুটের

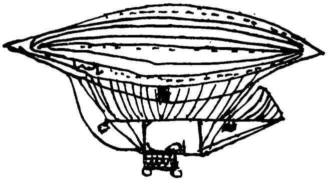

মত। এখানে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত পাখা লাগানো হয়। এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৫ মাইল।

উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরো দুই বিজ্ঞানী নিয়ন্ত্রণশীল বেলুনের গবেষণায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। এঁদের একজনের নাম স্যানটোস ডুমোঁ। ইনি হলেন ব্রেজিলের বাসিন্দা। স্যানটোস বেলুনে চড়ে প্যারিসের

(পরের অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়)

(১১ পৃষ্ঠার পর)

বাঘটা বোধ হয় করবেটের সাড়া পেয়েই সরে পড়েছিল। মোষপালক লোকটা করবেটের অনেক দিনের চেনা। তার অনুরোধে তাকে নিরাপদে জঙ্গল পার করে দেবার জন্যে মোষ তাড়িয়ে নিয়ে চল্লেন। লোকটা জানতো শিকারের চেয়ে ফোটো তোলার দিকেই করবেটের আগ্রহ বেশী। তাই সে বারবার অনুরোধ করলো— আপাততঃ ফোটো তোলা বন্ধ রেখে বাঘটাকে মারবার চেষ্টাই যেন করবেট করেন। না হলে বাঘটা রোজ একটা করে মোষ মারতে শুরু করলে, পঁচিশ দিনেই সে সর্বস্বান্ত হবে।

মোষ পালককে জঙ্গল পার করে দিয়ে করবেট সেই ফাঁকা জায়গায় ফিরে গেলেন। বাঘের সাড়া শব্দ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বাঘ নিজে তার অবস্থান না জানালেও, জঙ্গলের প্রাণীরা বাঘের উপস্থিতি জানিয়ে দেবে।

বেলা প্রায় তিনটে, চড়া রোদ। আরাম করে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঢুলছেন করবেট। বাঘের ডাকে তন্দ্রা ভেঙে গেল। বাঘটা থেকে থেকে ডাকছে। স্পষ্টতঃই সে একজন সঙ্গিনী খুঁজছে। মনে হল বাঘটা জঙ্গলের ওপাশেই কোথাও রয়েছে। বোধহয় তিন কোয়ার্টার মাইলের মধ্যেই কোথাও, রবিন (কুকুর) সঙ্গে নেই। কাজেই একলা বাঘের খোঁজে যাওয়া নিরাপদ নয় বুঝে করবেট ঠিক করলেন বাঘটাই তাঁকে খুঁজে বের করুক।

গাড়ির রাস্তা ধরে কয়েকশো গজ ছুটে গিয়ে রাস্তায় রাইফেল নামিয়ে রেখে করবেট গাছে চ'ড়ে, বাঘিনীর গলায় আওয়াজ নকল করে, তিনবার ডেকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে রাইফেল তুলে নিয়ে হাঁক দিতে দিতে দৌড়ে ফিরে গেলেন করবেট। বাঘের অপেক্ষায় বসে থাকা যায়, ফাঁকা জমিতে এমন কোন জায়গা ছিল না। শেষ পর্যন্ত কালো দুর্গন্ধ জলে ভরতি একটা ছোট্ট গর্তের পাশে খোলা জমির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন জিম করবেট। সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর পর্যন্ত রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়।

রাইফেলটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে সেফটিক্যাচ খুলে মাটিতে কনুই-এর ভর রেখে করবেট আস্তে একবার হাঁক দিলেন, বাঘের নিশানা পাবার জন্যে। প্রায় একশো গজ দূর থেকে বাঘটা সাড়া দিল।

বাঘটার আসতে প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড সময় লাগবে অনুমান করে করবেট এক, দুই করে গুনছেন। ধীরে ধীরে আশি অবধি গুনেছেন। তাঁর সামনে ডান দিকে দশ গজ দূরে ঝোপটা নড়ে উঠলো। চেয়ে দেখলেন চার ফুট উঁচু ঝোপের ওপর বাঘের বিরাট মাথাটা বেরিয়ে আছে।

বাঘের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। রাইফেল-এর নলটা ঘুরিয়ে টিপ করতে গিয়ে করবেট দেখলেন, বাঘের মাথাটা ঠিক তাঁর নিশানা বরাবর নেই। চোখের এক ইঞ্চি নীচে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপলেন করবেট।

করবেট আশা করেছিলেন গুলি খেয়ে বাঘটা মরে পড়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। একলাফে ঝোপের ওপর দিয়ে সোজা শূন্যে উঠে ঝড়ে-ওপড়ানো একটা এক ফুট মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর আছড়ে পড়লো। বাঘটা তখনো মরেনি। রাগে আত্মহারা হয়ে নখ দিয়ে আঁচড়ে গাছটাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়তে লাগলো।

বাঘটা তখনও মরে নি। সামান্য শব্দেও যদি এদিকে তার নজর পড়ে এই ভয়ে করবেট রাইফেলে আর গুলি ভরতে পারেন নি। প্রায় ঘণ্টাখানেক শুয়ে থেকে ঘেমেছেন করবেট। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন করবেট।

পরদিন সকালে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে করবেট ফিরে এলেন সেই জায়গায়। খোলা মাঠের প্রান্তে যে গাছটা ছিল, লোকটা তার মগডালে উঠে ভালো করে চারদিক দেখে জানালো বাঘটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। যেখানে বাঘটা আছড়া আছড়ি করেছিল সেই দিকে এগিয়ে গেলেন করবেট। জায়গাটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। চারিদিকে রক্ত। কাছাকাছি এক টুকরো হাড়—বাঘের খুলির অংশ।

সব চিহ্ন পরীক্ষা করে বোঝা গেল বাঘটা দুশো গজ দূরে একটা মস্ত শিমুল গাছের দিকে গেছে। সদ্য আহত বাঘ —পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম জন্তু। এর পিছু নিতে গিয়ে কোনওরকম বিপদের ঝুকি নেওয়া যাবে না।

বাঘের চলে যাবার পথে একটা গাছে উঠে করবেট শট-গান থেকে দূরে ঝোপ লক্ষ্য করে ছররা ছুঁড়তে লাগলেন। হাতের গোড়ায় রাইফেল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে বা ছররা গায়ে লেগে বাঘটা যদি ঝোপের ভেতর থেকে তেড়ে আসে, তাকে গুলি করা যাবে। শিমুল গাছটা লক্ষ্য করে করবেট শেষ গুলি ছুড়তে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। তারপরে সব চুপচাপ। কার্তুজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। লোকটিকে ডেকে নিয়ে করবেট বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিন করবেট ফিরে এসে দেখলেন সেই মোষ-ওয়ালা মোষ চরাচ্ছে। ছুটো বাঘের ডাক সে শুনতে পেয়েছে। রক্তের গন্ধ অনুসরণ করে মোষগুলোই তাকে দেখিয়ে দেয় কোথায় বাঘটা পড়েছিল। সেখানে সে রক্ত আর হাড়ের টুকরো দেখতে পায়। মোষওয়ালার ধারণা খুলির খানিকটা উড়ে যাওয়ার পর বাঘটা কয়েক ঘণ্টার বেশী বাঁচতেই পারে না।

মোষওয়ালার কথা মতন মোষ দিয়ে বাঘ খুঁজে বের করার প্রস্তাবে করবেট সম্মতি দিলেন। শিমুল গাছের কাছে একটা ছোট গর্তে শুকনো থেঁতলানো পাতার ওপর তাজা রক্তের ছোপ। আগের দিন করবেট যখন একশোটা কার্তুজ খরচ করেন, তখন আহত বাঘটা এই গর্তে শুয়েছিল। মোষের দল নিয়ে করবেটকে আসতে দেখে সবে মাত্র সরে গেছে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিত্য যাওয়া আসার পথে চার দিনের দিন করবেট নরম মাটির ওপর একটা বড় মদ্দা বাঘের পায়ের দাগ দেখতে পেলেন। এইটিই সেই আহত বাঘ কিনা বোঝা গেল না। করবেট ঝোপের মধ্যে ঢুকে শিমুল গাছের তলায় সেই গর্তটার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুটা গিয়ে ফুট দশেক চওড়া এক শুকনো নালার কাছে আসতে নজরে পড়লো বাঘের পেছনের পা আর লেজ। রাইফেলের গুলিতে বাঘটির পা ভেঙে দেওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু এটা যদি সেই আহত বাঘ না হয়? বাঘটা চলে যাওয়ার পর সেইখানে গিয়ে করবেট দেখেন মাটিতে কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত। কিন্তু তখন আপসোস করে লাভ নেই।

বাঘটা সম্ভবত ঝরনার দিকে গেছে অনুমান করে করবেট গুঁড়িপথ দিয়ে ঝরনার দিকে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ বাঁদিকে একটা শম্বর ডেকে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ছুটে পালাল। বাঘটা কাছেই কোথাও আছে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা শুকনো কাঠি ভাঙার জোর শব্দ শোনা গেল। বাঘটা ওইখানেই আছে—শম্বরটা নির্ভুল হদিশ দিয়ে গেছে। করবেট হামগুড়ি দিয়ে শব্দটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন।

তিরিশ গজ এগোবার পর চোখে পড়লো একটা লালমতন জিনিসের ওপর রোদ্দুর পড়ে ঝিকমিক করছে। বাঘও হতে পারে। মাথা নুইয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ডানদিকে দুগজ পথ অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। মাথা তুলতেই দেখেন বাঘ একেবারে তার সামনে। ……পর পর দুটো গুলি খেয়ে বাঘটা নিঃশব্দে কাত হয়ে পড়লো।

* * *

(১৬ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

ইফেল টাওয়ারের চারপাশে পাক খেয়ে সকলকে বিস্মিত করে দেন।

জার্মানীর কাউন্ট ভন জেপেলিন বিরাট আকারের বেলুন আবিষ্কার করেন। নিজের নামে এই ধরনের বেলুনের নাম দেওয়া হলো জেপেলিন। ইওরোপ ও আমেরিকায় এর ব্যবহার ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু ততদিনে মানুষের দুরন্ত মনীষা অন্বেষণ করেছে এরোপ্লেনের ঠিকানা। তাই বেলুন ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল পৃথিবীর আকাশ থেকে। কিন্তু আজও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ত হাইড্রোজেন বেলুন ছাড়া হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই প্রশান্তর বুকে উড়ে যাবে এযুগের বেলুন। জানি না, কি লেখা আছে এই দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ পাতায়। মানুষ কিন্তু চিরদিনই ডেইডেলাসের মত প্রিয় পুত্র অ্যাকিলাসের দুহাতে জুড়ে দেবে পাখীর পালক।

সূর্যের উত্তাপে মোম গলে যাবে। চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যু দেখেও স্থির প্রতীক্ষায় অটল থাকবেন অ্যাকিলাস। কারণ, মানুষের যে জানার শেষ নেই।

* * * (আগামী সংখ্যায় থাকবে: এরোপ্লেন আবিষ্কারের কাহিনী)

(১৫ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

খ্যাচ্-শব্দে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল একজোড়া কালো চকচকে ডার্বি সু, নজরে এলো অ্যাকশন ইন চার্জ রঞ্জিত ঘোষের হাতের লাইটার জ্বলসে উঠেছে। নীলাভ শিখায় সিগারেট ধরাতে ধরাতে ঠোঁটের কোনা দিয়ে বলল, চলুন, চীফের জরুরী তলব। এবার একেবারে নাচিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। রঞ্জিত ঘোষের বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিতে নিতে শুভেন্দু উত্তর দিল, যার বিয়ে তার মনে নেই। পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। চীফ স্বয়ং স্পটে ছিলেন, নিকোলাই আস্ত্রেভস্কি আর ডক্টর জাহাঙ্গীর এক সঙ্গে পালাম ফিরে এলো। চীফ ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন। ওরা কাবুল রওনা হয় এবং কাবুল থেকে তাসখন্দে ফিরে যায় আস্ত্রেভস্কি। আমাদের কাবুলের লোকজন ডক্টর জাহাঙ্গীরকে খবর দিয়েছে, করাচীতে খবর এসেছে যে ফ্রান্স ছয় স্কোয়াড্রন মিরাজ জঙ্গী বিমান মিশরকে দেবে এবং ইরাকের মজুদ পুরোনো কিছু মিরাজ পাকিস্তান পাবে। অথচ লেহ্‌তে চীফ্ নিজে পাকা ব্যবস্থা করে এসেছেন যে স্যামখুড়ো এটা আটকাবে, ডক্টর জীন ডেলুক্কুয়ার শপথ করে করাচী ফিরে গেছে।

কনের ঘরে মেসো, বরের ঘরে পিসে, বলতে বলতে ঘরে ঢুকল ঈশা পিছনে চীফ। শশব্যস্ত হয়ে ওরা উঠে দাঁড়ায়। বসতে বলে চীফ নিজে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। বুঝেছ, গিলগিট থেকে লাসা রা ! শেষ পর্যায়ে, তামাম ইসলাম রাষ্ট্র, আর পিকিং যদি থার্ড ওয়ার্ল্ড খোলে, বিপদ স্যাম খুড়োর আর এ দিকে টেকো মধভের তাঁবে থাকবে না পাকিস্তান ও দিকের আফগানিস্থান, মিশর। আমার স্বার্থ প্রতিবেশী দুজনকে পরস্পরের সঙ্গে বেশী মাখামাখি না করতে দেওয়া। অর্থাৎ বেশী শক্তিশালী না হয়ে পড়ে, সেটা দেখা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ওরা দুজনে যখন জঙ্গী আর বোমারু বেচবে তাতে দোষ নেই কিন্তু। স্যামখুড়ো পিকিং আটকাতে করাচী যাচ্ছে, আবার দিল্লী আটকাতে নিজেই বেকায়দায়। আসল কেনাবেচার সঠিক খবর আমার চাইই।

* * * *

আচমকা ঘরের মধ্যে ঢুকল একটি যুবক, প্রকৃতির রুক্ষতা এর সৌন্দর্যকে চেপে রাখতে পারেনি। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, জে তো, (আমি এসেছি), রাউহ্ (চলে যাও)। ববের হাত দুটো পিছনে পিছমোড়া করে বাঁধা, হাঁটু ভেঙে, পিছনে ঠেস দিয়ে বসেছিল, ভিজে চামড়ার ফালি ভিজিয়ে বাঁধা, শুকাতেই শক্ত হয়ে, গায়ের মাংসের উপর কেটে বসে যাচ্ছে। মেয়েটি চলে যাবার আগে করুণ হাসল ইরশাদ, ইঙ্গিতে যুবককে দেখিয়ে বলল আখুয়া, (আমার ভাই), আয়হো, ফাওকা, আমি যাই উপরে। বব্ বুঝতে পারল জেব্রানের নিজস্ব জাহাজের নীচের কেবিনে আছে, তাহলে নাটের গুরু জেব্রান। ভাঙা আরবি ভাষায় কথাবার্তা চালাতে শুরু করল, কিন্তু সীমিত ভাষা ান দিয়ে কতক্ষণ আর কাজ চালানো যায়। গতি স্তব্ধ হয়ে গেল, এঞ্জিন বন্ধ শুধু দোলা লাগছিল, মৃদু ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভাঙার শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। দুর্বোধ্য ভাষায় কি করে কাজ হাসিল করবে, তাই ভাবছিল, হঠাৎ তীক্ষ্ণ কর্কশ এক ডাকে সচকিত হয়ে উঠল, সীগাল ডাকছে, মনে মনে হাসল। একবার এডেনে ও জেব্রানের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে টক্কর দিয়েছিল, সেটা "অপারেশন পিঙ্ক লেগেড সী গাল "নামে ছিল। করাচী বন্দরে ববের স্যাঙাৎ ছিল বহু। আবার তীব্র ডাক, কান খাড়া করে শুনল বব্। কি ভাবে মুক্ত হওয়া যায় ? খেজুরে আলাপ শুরু করল। আইশ (এটা কি ?) বাখেরা (জাহাজ) ইসক্নে (আমাকে পানি দাও), কাঁধে ঝোলান জলের বোতলটা দিয়ে বলল ইশরাব (পান কর), ইশারায় বাঁধা হাত দেখাতেই, জল খাইয়ে দিল, গলায় ঢেলে ঢেলে, কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে, বারণ করল। ইঙ্গিতে ওর বুশ সার্টের পকেট থেকে—সিগারেট ও ও লাইটার বের করতে বলল। কালো ইবোনাইটের রনসনের গ্যাসলাইটার দেখিয়ে কৌতূহলের প্রশ্ন করল নারুল ? (আগুন ?) মনে মনে বাহবা দিল, উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল। আবার জিজ্ঞেস করল কিবরীতুন (দেয়াশলাই)। কাঁদে পা দিল, সহজ টোপটা ধরল। জ্বালাতে চেষ্টা করতেই, বব বড় একটা নিঃশ্বাস টেনে

দম বন্ধ করে রাখল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়বার জ্বালাতে চেষ্টা করতেই যুবকটি কাশতে শুরু করল, দমবন্ধ করা কাশি, চোখ মুখ লাল হয়ে গেল, খাবি খেতে লাগল, সাফোকেশন, গলায় হাত বুলোতে, হাত ঘষতে ঘষতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর কাৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। খামচে ধরার চেষ্টা করল মেঝেটা, শেষ আরেকবার ঝটকানি মেরে নিথর হয়ে গেল দেহটা। মাটিতে পা ঝুলিয়ে দিল বব, পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে, লাইটারটা চেপে ধরে উপরে আনতে সবে মাঝপথ এসেছে। আঙুলের চাপটা কম বেশী হয়ে যাওয়ায় পিছলে পড়ল, অভিশাপ দিল নিজকে, মেঝেতে নেমে বসে পড়ে পিছন দিক ফিরে লাইটারটা ধরল। হাতের নাগালের মধ্যে এনে, হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে, তলায় নবটা ঘুরিয়ে বন্ধ করল। একটু অসতর্ক হতেই ছিটকে গেল স্প্রিং লাগান ষ্টিল ব্লেডের ফালিটা, অস্ফুট গাল দিল নিজেকেই। মনোযোগ, একাগ্রতা এনে, পিছন ঘষটে ঘষটে ব্লেডটা দু আঙুলের ফাঁকে ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে থাকল, অমানুষিক পরিশ্রম, ঘামে গা ভিজে জব জব করছে, অসহ্য গুমোট আবহাওয়া, তারপর এই শারীরিক কায়দা ঘাড় টনটন করছে, হাত পিছলে যাচ্ছে, বারবার থামে, যেখানেই ব্লেডটা লাগছে কেটে যাচ্ছে, ঘাম লেগে জ্বালা করছে। নিজেকে মুক্ত করে কব্জিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রক্ত চলাচল হতে দিল। একটা সিগারেট ধরাল লাইটারটা আলতো করে আদর করল, চুমু খেয়ে, শুক্ত ছুঁড়ে লুফে নিয়ে বুক পকেটে রাখল। কেবিনের লকটা ভেতর থেকে লাগিয়ে, পোর্ট হলের কাঁচটা নিপুণভাবে ভাবে কেটে ফেলল কাঁচ কাটা হীরে দিয়ে, এটা ওর নিজস্ব উদ্ভাবন। গামমেটালের একটা বাড়তি সিগারেট কেস ওর পিছনের পকেটে থাকে, তার খোলবার নবটায় বড় একটা কাঁচ কাটা হীরে বসিয়ে নিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ঢুকতে লাগল, ফুসফুস ভরে বাতাস নিয়ে, আস্তে মাথা গলিয়ে বাইরেটা পর্যবেক্ষণ করে নিল, জলের লেভেল হাত তিনেক নীচে। একবার কেবিনটা পরখ করে নিয়ে টুক করে জলে নেমে পড়ল. শরীর গলিয়ে বের করে নিয়ে এসে। এক বুক হাওয়া নিয়ে টুপ করে ডুব দিল জলের নীচে, এক দমে কয়েক গজ ডুব সাঁতার দিয়ে ভূস করে উঠল, সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে, তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগল। অবসন্ন ভাবে পাড়ে এসে পড়ে রইল, ক্লান্ত, সাঁতরাবার মতন জল না থাকায় শেষ কয়েক ফার্লং হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছিল হানিফ আর ইব্রাহিম।

পরিত্যক্ত একটা জেটীর কাছে উঠেছিল, সারি সারি গুদাম ঘর। নিকস কালো অন্ধকারের মধ্যে অতিকায় দৈত্যের মতন আকাশটা ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হানিফ আর ইব্রাহিমকে ইশারায় দেখাল জেব্রানের প্রাসাদতুল্য আবাসস্থল। নূতন জেটীতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে জেব্রানের প্রমোদ তরণী "ক্ষুরা" যেটাতে বব্ নিজে আটকে ছিল!

জলজ উদ্ভিদ সূর্যাস্তের পর সমুদ্র থেকে গ্যাস বের করে দিচ্ছে, সালফার মতন গন্ধ ম ম করছে। অজস্র সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ ভাটার টানে কূলে পড়ে আছে, ঢেউ তাদের ফেলে রেখে চলে গেছে।

ববের পা খালি, বুশসার্ট ট্রাউজ সবই সিক্ত। ঘড়ি, লাইটার, মেটাল কেসটা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নেই, ভিজে সিগারেটগুলো বুক পকেট থেকে বের করে ফেলে দিল।

নিঃশব্দে একটা ডিঙি জল কেটে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ একজন লাফিয়ে নেমে পড়ে, ঠেলে পাড়ে তুলতে নজরে এলো সুলতানকে। ডিঙি থেকে নামল আয়ান রশীদ, সেলাম আলেকুম, আলেকুম সেলাম ভাইসাব, ডিঙি টেনে হিঁচড়ে তুলে উল্টে রাখল ওরা চারজন। নিঃশব্দে বব দেখছিল, রশীদ হাত ধরে নিয়ে এগুলো, একটা গুদাম ঘরের তালা খুলে ওরা ভিতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে মালপত্র ঠাসা, ঘরের মধ্যে ঘর, তারপর কত কারসাজি, কত গলি ঘুঁজি, নীচে নাব, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ, কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে অবশেষে পৌছাল, রশীদ অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে সামনে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে ববকে ঢুকতে অনুরোধ করলো। কিছুক্ষণ পর উষ্ণ আরামদায়কঘরে আয়েস করে বসে কথাবার্তা শুনছিল বব্। মহার্ঘ পরিচ্ছদে ওকে যুবরাজ মনে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে কয়েক পাত্র "রাকী" পান করে

সতেজ ও সুস্থ হয়ে উঠেছে, নীরবে ইজিপ্সীয়ান ব্রেণ্ড সিগারেট ফুঁকছিল ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। এখানকার জলপুলিস, উপকূল রক্ষী, শুল্কবাহিনী সবই জেব্রানের হাতের মুঠোয়। সালমা আর রেশমা খাওয়ার আয়োজন শুরু করল। পারস্য উপসাগরের উপকূলে ধনীদের একচেটিয়া কারবার, বাহরেণ, আবুধোবী, মস্কত দুবাই, ওর বিশাল ব্যবসা, নাইট ক্লাব, পাঁচ তারকা হোটেল, ক্যাবারে নাচের আসর, জুয়া, ব্যাপক আয়োজন, ওর খরিদ্দার চোরাচালানকারী মুনাফাবাজ কিছু শেখ কিছু ভারতীয়ও আছে। কিছুদিন যাবৎ তারা আর খোশমেজাজে ফূর্তি করতে পারছে না, ভয়ে কাঁটা হয়ে সিঁটিয়ে আছে, আতঙ্কিত। ববের কাজ এদের চাইকে ভরসা দেওয়া। সরকারী মহল থেকে আশ্বাস কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু খুব একটা আশা ভরসা নেই। বব্ আড়চোখে তাকাল, হানিফ চোখে চোখ রাখল, ইব্রাহিম, ওর নিজস্ব রীতি মত পেয়ালার পর পেয়ালা রাকী শেষ করছে, ইব্রাহিম মাতাল হয় না, সুলতানের নজর সালমার উপর। যেচে ফাঁদে পা দিয়েছে ওরা, নিজেকে ধিক্কার দিল, চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে, নিজেদের হঠকারিতার জন্য কতগুলো স্মাগলারকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে? চীফ ওর উপর ভরসা করে, পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন, নিজে দায়িত্ব নিয়ে। সমস্যা আপাততঃ এই ধূর্ত ও হিংস্র জীবটির ডেরা থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়? এর পর আছে অমিত শক্তিশালী দুর্ধর্ষ জেব্রানের সঙ্গে তারই জমিতে মোকাবিলা করে ফিরে যাওয়া। হঠাৎ সুলতান উঠে দাঁড়াল, হানিফ আর ইব্রাহিম শিকারী চিতার মতন উদগ্রীব, বব এক লহমায়, একটানে ভেলভেট, জরি, সিফনের মধ্যযুগীয় পরিচ্ছদ খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল, বিশাল ব্রকেডের পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিল একধারে, কান পাতল দেওয়ালে, ক্ষিপ্র লঘু পায়ে মানুষখেকো বাঘের মতন নিঃসাড়ে বের হলো বব্, পিছনে ওরা তিনজন, বব জানতো যে পথে এখানে ঢুকেছে, সে পথে ফেরা মূর্খামী, প্রত্যেক বাঁকে মনিটর দেখেছে, ওয়াচ আই রয়েছে আরও কত কি কায়দা রয়েছে কে জানে, সদা সতর্ক হুশীদ এত নিশ্চিত, দুয়ত মরণ ফাঁদ পাতা আছে। ইঙ্গিতে সুলতানকে কাছে ডাকল, ইশারায় দেখাল ওকে। ওর কাঁধে পা দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল, সারা শরীরটা দুলিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে সিলিং কাঠামোর ফ্রেমটা ধরে ঝুলে থাকল, দুহাতের শক্তিতে সারা শরীরটা টেনে হিঁচড়ে উপরে টেনে তুলল, সন্তর্পণে দুপা রেখে জায়গা করে নিল, এক সেকেণ্ড ভেবে নিল। একে একে দুজনকে দ্রুত টেনে তুলল। পা দুটো আটকে শরীরটা নীচে ঝুলিয়ে, বিশাল দেহী সুলতানকে হাঁচড়ে পাছড়ে টেনে উপরে তুলে নিল, মচ মচ আওয়াজ উঠছে, সিগারেট কেসটা হিপ্ পকেটের থেকে বের করে জমির সমান্তরাল করে ধরতেই লাল ছোট্ট আলো দপ দপ করে জ্বলতে লাগল, ওদের সতর্ক করে দিল লোহার ফ্রেম ইলেকট্রিফায়েড, ছুঁলেই শক্ লাগবে। পিরামিড হতে হবে, হাতের তালুতে আঙুল দিয়ে এঁকে বোঝাল, সরু অপরিসর কাঠের বীমের উপর ব্যালান্স করে মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনা দুজনের দু কাঁধে হাত সোজা বাড়িয়ে চেপে ধরল, হানিফ দাঁড়াল দুজোড়া হাতের উপর, তার দু ঘাড়ে পা দিয়ে ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে, ছাতের করগেট টিনের নাট বল্টু খুলতে লাগল। আস্তে চাড় দিয়ে ফাঁক করে ফেলল এক ঝলক তরতাজা মুক্ত হাওয়া ঢেউ খেলে গেল। ধীরে ধীরে ও বের হয়ে গেল, একে একে তিনজনকে বের করে দিয়ে, কসরৎ করে ওদের বাড়ান হাতের নাগাল পেল! সুলতান মাথা গলিয়ে পুরো শরীরটা ঝুলিয়ে দিল, বব খিমচে ধরল। তারপর বুক ঘষটে বেরিয়ে এসে ফুসফুস ভরে দম নিল।

বাজপাখীর মতন দৃষ্টি, জেব্রানকে দেখছিল, বাইনাকুলারটা চোখ থেকে নামিয়ে সুলতানকে ফেরত দিল। সিয়া, কে. জি. বি. উভয়েরই লক্ষ্য হয়েও কেন এত নিরাপদ, বুঝতে চেষ্টা করল। পাকা সাড়ে ছয় ফুট দৈর্ঘ্য ছাতি চল্লিশ হবে, টিকালো নাক, পাতলা ওষ্ঠ, টকটকে রঙ, ঝোলা লালচে গোঁফ নেবে এসে থুতনীর দাড়িতে মিশেছে, ছাঁটা মেহেদী রঙ দাড়ি, পাতলা কোঁকড়ান কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ খেলান চুল, ধনুকের মত আঁকা ভ্রূ, নীল চোখের তারায় স্বপ্নের আমেজ, একটুকরো হাসি ঠোঁট ছুঁয়ে, কবিত্বময় দেবদূতের বাস্তব মূর্তি। সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের গরীবদের ফরিস্তা, আর ধনীদের শয়তান জেব্রান

রাজপুত্র হলেও ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মী, কোরান ছাড়া চিন্তা নেই। বব নিজে জানে এই লোকটা মদ ছোঁয় না, সুরা ও নারী দুই পাপ শুধু নয়, স্পর্শ করে না। কোন নেশা নেই, এক দৌলতি ছাড়া, তাও অকাতরে খয়রাতি করে, এর পিতা ছিল ইস্তাম্বুলের পাপচক্র নিষিদ্ধ জগতের মধ্যমণি, পরে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম ক'রে তার রাজত্ব, বিবাহ করেন সিসিলি কর্নিকার এক দুর্ধর্ষ উপদলপতির একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে। পিতার অবয়ব ও মাতার সৌন্দর্য পুরোপুরি সংমিশ্রণে কিংবদন্তীর নায়ক তার রাজত্ব আরব সাগর অবধি বাড়িয়েছে। তৈলকূপের মালিক শেখরা তাগাদা দেয় তাদের প্রভুকে, দুষমনকে শায়েস্তা কর, রয়্যালিটির মাত্র কয়েক কোটি মুদ্রার মধ্যে যদি দশলক্ষ বদমাশটাকে যোগাতে হয় তবে হারেম রাখি কি করে? প্রভুরা জানেন সদাসতর্ক জেব্রানের দুর্ধর্ষ বাহিনী অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে সর্বদা তাদের নিরাপত্তা না রক্ষা করলে, ইহুদীরা কবেই কব্জা করে ফেলত তামাম এলাকা। ইসলাম ধর্মের নামে উন্মাদ, তছনছ করে দেয় বহু রাজনীতির চালককে। পিতা ছিল মধ্য প্রাচ্যের মুকুট হীন বাদশা পুত্র সারা প্রাচ্যের শাহেনশা। নিট ভাষায় সুপণ্ডিত, কখনও মাদ্রিদ, কখনও লিসবন নিঃশব্দে যাতায়াত। বেরুইট, ইস্তাম্বুল বাগদাদে কয়েকলক্ষ অনুচর। এহেন নায়কের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। হানিফ আর ইব্রাহিম ঘুরে এলো, অসম্ভব প্রবেশ করা। গভীর পরিখা সীমানা প্রাচীরের গা ঘেঁষে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ আছে, তীব্র স্রোত সৃষ্টি করা হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে, কে জানে জলে হাঙর-টাঙর ছাড়া আছে কিনা। বব শিউরে উঠল, ওরা চারজন বেহেসেবী ভাবে ছাতের উপর বসে রয়েছে, নিলোট মূর্তি, সহজ লক্ষ্য বস্তু হতে কতক্ষণ? গুটি গুটি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল, এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে অবলীলাক্রমে পার হয়ে গিয়ে অবশেষে থামতে হলো। ফন্দী আঁটল যুক্তি করে, থাক করে সাজান কাঠের পাটাতন ছিল, নৌকা মেরামতের কারখানাতে গাদা করে রাখা তক্তা থেকে একটা মজবুত অথচ হাল্কা লম্বা কাঠ টেনে তুলল শেষ গুদামঘরের ছাদে, লম্বালম্বি করে বের করে দিল দুই তৃতীয়াংশ, বব তৈরী হয়ে নিল, ঘড়ি, লাইটার, সিগারেট কেস ছাড়া নেবার মতন সঙ্গে ছিলই না কিছু। বাকী তিন জনা এক তৃতীয়াংশ তক্তার উপর চেপে বসল পা গুটিয়ে। কালো অন্ধকারে একপাশে সমুদ্র, সামনে উঁচু সীমানা প্রাচীর পনেরো ফুট পাকা তার উপর দশ ফুট কাঁটা তার ঘেরা, ছোঁয়া মানে লটকে থাকা কারেণ্ট খেয়ে। গুঁড়ি মেরে বব এগিয়ে গিয়ে তক্তার ঝুলন্ত দিকটায় শেষ সীমানায় পৌছাল, স্ন্যাকসটা টেনেটুনে ঠিক করে নিয়ে জোড়া পায়ে উঠে দাঁড়াল, ঘড়ি দেখল, রক্ষীদের খবর মত কুত্তার পাল ছাড়তে এখনও আধ ঘণ্টা দেরী, হাউণ্ড, টেরিয়ার, ডেন প্রভৃতি ভজন খানেক হিংস্র কুত্তাকে সারাদিন অন্ধকার কুঠরীতে অনাহারে রেখে ক্ষেপিয়ে রাখে, রোজ সামান্য খেতে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। টুঁটি ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে সামনের কুল যদি নাগাল পায়। হাওয়া উঠল সাগরে, সুইমিং পোর্ডের মত ডাইভ দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়াল, চাপ দিয়ে তক্তাটাকে স্প্রিং করাতে শুরু করল। প্রথমে ছোট লাফ, এক-দু-তিন……দশ, প্রায় ফুট দুয়েক শূন্যে জোড়া পায়ে লাফিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে দোদুল্যমান তক্তাকে ডিঙ্গি মেরে সারা শরীরটা শূন্যে তুলে দিয়ে ঝাঁপ খেলো, এক পাক শূন্যে ভল্ট খেয়ে ওপারে গিয়ে পড়ল ঘাসের উপর। নিস্পন্দ হয়ে একটা পুরো মিনিট পড়ে থাকল। কোন কিছু সাড়া শব্দ খাড়া সজাগ কানে যখন ধরা পড়ল না, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রায় বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

ওরা তিনজন তক্তাটাকে টেনে ঢুকিয়ে নিল, উপুড় হয়ে শুয়ে বাইনাকুলারে চোখ লাগাল। নিঃশব্দে অবলোকন ছাড়া আর কি করতে পারে। নীরব দর্শক হয়ে সুলতান দেখল কালো আঁট সাঁট স্ন্যাকস আর কালো গায়ে চেপে বসা গোল গলা গেঞ্জী পরনে বব গিরগিটির মতন দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে কার্নিসে ঝুলছে, বিড়ালের মতন নিঃশব্দে অলিন্দে লাফিয়ে পড়ল আর দেখা গেল না। ওরা নীরবে নেমে এসে ডিঙ্গিটা ঠেলে বুক জল অবধি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একে একে টাল মাটাল অবস্থায় চড়ে, দ্রুত হাতে দাঁড় টেনে এগিয়ে গেল বন্দরের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না নির্দেশ আসে।

দুর্ভেদ্য এক বিশাল হলঘরে বুখারা গালিচার উপর হাঁটু মুড়ে উপাসনার ভঙ্গীতে বসেছিল জেব্রান, অদূরে মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ছিল আজমল খাঁ, পরনে সামরিক পোশাক, হাঁটু অবধি ঝকঝকে মরক্কো চামড়ার বুট, পা দুটো একটা গদি আঁটা কুশনের উপর ক্রস করে রেখে নাচাচ্ছিল ও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল উৎকৃষ্ট মহার্ঘ সোনালী ব্রাণ্ডি। জেব্রান নিজে স্পর্শ না করলেও পর্যাপ্ত মদ মজুত রাখে মেহমানদের জন্য। স্ফটিকের মালা জপছিল জেব্রান, ভাবছিল দীনদুনিয়ার মালিকের যদি মর্জি হয় তবেই মার্কিন মুলুক থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া অবধি রাজ কব্জা হবে। এক দিকে সিয়া অন্যদিকে ইহুদীরা আদা জল খেয়ে লেগে আছে ছিনে জোঁকের মতন। মেরু ভালুকের মতি গতি বোঝা যাচ্ছে না, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্রমশঃ পীত বন্ধুদের অনুকূলে। মরণ কামড় খেয়ে অস্থির। পেট্রল যদি না পায় মরিয়া হয়ে উঠবে, সেই ব্যবস্থা বানচাল করে দিল সর্বনাশা ইরাকের ভূমিকম্প কয়েক কোটি আশরফি খয়রাতিতে গেল। ও. এস. এসকে আলজেরিয়ায় প্রচণ্ড মার দিয়েছিল জেব্রান আর আজমল, সেই মার প্রয়োজন ইন্দোনেশিয়ায়। একটা ক্রত বোঝাপড়ায় আসবে জেব্রান। সর্বশক্তি নিয়ে মোকাবিলা করবে এবার।

প্রেতাত্মার মতন নিঃশব্দে বব নিষ্পলক ভাবে দেখছিল এই সেই সম্রাট, মধ্যপ্রাচ্যের আমীর জেব্রান, কিন্তু ছদ্মবেশ ফকিরের মতন জীবন যাপন করে। যেখানে অনাচার, অত্যাচার, শোষণ, সেখানেই জেব্রান। যেখানে ক্ষুধার্ত জনতা আর চরম দারিদ্র্যতা, অবিচার আর অন্যায় জুলুম উৎপীড়ন আর নিপীড়ন সেখানে মুক্তি যোদ্ধা, ত্রাতার ভূমিকায় জেব্রান। আচমকা ওর হাত দুটো পিছনে টেনে মুচড়ে কোমরে প্রচণ্ড লাথি পড়তেই সম্বিৎ আসল। কিন্তু দেরী করে ফেলেছে, মুহূর্তের অসতর্কতা ওকে বাধ্য করল ধপ্ পড়তে। মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে পালটি খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ল। অস্ফুট আওয়াজ করে শক্ত জোড়া পায়ে লাথি কষাল। আর্তনাদ উঠল, থুতনীতে লেগেছে, আন্দাজ তাই ছিল, চকিতে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু এবার দুশমন হুঁসিয়ার, তলপেট লক্ষ্য করে পা ছুড়ল, গ্যাঁক করে উঠল। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ করে বসে পড়ার ভঙ্গী করতেই উল্লসিত হয়ে, সতর্কতা ভুলে গিয়ে যেই দ্বিতীয় লাথিটা 'কষে ঝাড়ল, প্রস্তুত হয়েছিল, কাঁধে পা দিল, ক্ষিপ্র হাতে পাটা ধরে মুচড়ে দুমড়ে দিয়ে যেন চিরে ফেলবে ভঙ্গী করতে দেখলএকটি পূর্ণ যৌবনা তার প্রতিপক্ষ, বন্য বিড়ালের মতন ফোঁসাচ্ছে, বব চিনতে পারল দামাস্কাসে একবার বাঁচিয়েছিল একে, তখন নাম বলেছিল ফারিদা। হঠাৎ প্রচণ্ড চোট লাগল। হাজার হাজার তারা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল।

সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলা সত্ত্বেও নিজস্ব সত্তাটি জাগিয়ে তুলছিল অতঃকিম? তখনও বব মুখার্জী বুঝতেই পারেনি শিয়রে প্রতীক্ষারত জেব্রান স্বয়ং। খোদাতাল্লার মেহেরবানীতে বহু দিনের খায়েশ আজ পুরো হলো, ববকে আমার এই গরীবখানায় মেহমান করতে পেরে। স্ফটিকের মালাটা হাতে ঘুরাতে ঘুরাতে সামনের দিকে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল ইশাক্ জেব্রান। বব আস্তে উঠে বসল, তাকিয়ে দেখল চারপাশ, কিন্তু বুঝতে পারল না কোথায় আছে সে। মনে পড়ল শুভেন্দু ওকে পারস্য উপসাগরের মুখে ওরদলবল সমেত নামিয়ে দিয়েছিল, শীষমহল হোটেলে খেতে বসেছিল, গুলিস্তান সিনেমা হলের থেকে মীনাকুমারী "পাকিজা" দেখে বের হবার সাথে সাথে স্যাডো করা হয়েছিল, শীষমহলে খেতে খেতে, কভার করে ফেলেছিল,— "ছুরা" থেকে বের হয়ে যেতে পেরেছিল। আবার ঢুকতেও পেরেছিল, কিন্তু বের হতে পারল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে ববের চোখে চোখ রেখে ইশাক বললো কেনই বা কষ্ট করে পালালে আবার কেনই বা ফিরে এলে এত কষ্ট করে।

তুমিই জান কেন আমাকে ধরে আনিয়াছিলে। ক্রুদ্ধ স্বরে বব জবাব দিলো।

আমার এলাকায় বিদেশী চালাক আগন্তুকদের প্রতি এটাই রেওয়াজ।

তারপর? প্রশ্ন করল বব।

অবাঞ্ছিতদের অতি চালাকীর ফল কি, সে তো তুমি জানো বব।

তুমি পুরানো । ভুলে গেছ ইশাক। তুমি সব বেমালুম ভুলে গেছ।

না আমি কোন কিছু ভুলিনি।

তাহলে রাজনীতিতে নামলে কেন ইশাক?

তোবা, তোবা, ইসলামী দুনিয়া ছাড়া আর কিছু করার ফুরসৎ কই।

বব সরাসরি প্রশ্ন করল, মিরাজ জঙ্গী বিমান কেনা বেচা। বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো না ইশাকের চোখে মুখে। আলজেরিয়াতে কিছু সাহায্যের জন্য ফরাসীরা আমার উপর কৃতজ্ঞ আর ইরাক—

সব ভুলে যাচ্ছ ইশাক। বব মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

বাগদাদের খলিফা, সেও আমার আপনজন। শোনো বব, লেবাননে ইশাইরা আমার ভাই বেরাদারদের সঙ্গে যে জঘন্য ব্যবহার করেছে, তার বদলা। ক্রুর কঠিন হয়ে উঠল ইশাকের মুখ। চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। নির্মম ও নির্দয় হয়ে যায় ইশাক খ্রীশ্চান আর ইসলামীর লড়াই-এর কথা মনে পড়লেই তার রক্ত টগবগ করে উঠে।

দমাস করে ঝটকায় দরজা হাট হয়ে খুলে গেল, ঝড়ের মতই ঘরে ঢুকল আজমল খাঁ। হাতে ভোঁতা নলের সাব-মেশিনগান। এ পাশে লয়লা হাতে আটত্রিশ বোরের কোবরা স্পেশাল। সম্বিৎ ফিরে পেল ইশাক্, এক লহমায় পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে ঘৃণায় মুখটা বিকৃত করে বলল, শয়তান তোর বেইমানির সাজা…কথাটা অসমাপ্তই থেকে গেল মাঝ পথে, রশীদের হাতের বাইসাইকেলের চেনটা আছলে পড়ল লম্বালম্বিভাবে ইশাকের মুখের উপর। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল মুখটা।

আজমল খাঁ বিদ্রূপমাখা কণ্ঠে বলল কিস্যাটা আমার কাছে শুনে নাও ইশাক জেহান, মধ্যপ্রাচ্যের তেল বেচে শেখদের আমিরী করার ফাঁকে তোমার মুনাফা শেষ হবে, আমরা বম্বে হাইতে তেল পেয়ে গেছি। সহসা অট্টহাস্য করে উঠল ইশাক। রক্তাক্ত মুখটা ভয়াবহ দেখতে লাগছে, সবিস্ময়ে রশীদ চেনটা শূন্যে আস্ফালন করিয়ে সজোরে মারার ঠিক আগের মুহূর্তে, রশীদের তলপেট লক্ষ্য করে মাথা নীচু করে আছড়ে পড়ল বব। চেনটা ঠিকরে আঘাত করল আজমল খাঁর চোখের উপরে। রশীদ লয়লাকে নিয়ে মেঝেতে পড়তেই শিকারী চিতার মতন বব পাল্টা উল্টে খেয়ে আজমল খাঁর নিম্নাঙ্গে দুহাতের কাটারী মারল। গ্যাঁক্ করে শব্দ উঠল। হাটু গেড়ে বসে পড়েছে আজমল, এক হাত তলপেটে অন্য হাত চোখে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারাটা মুখ। লয়লার কোবরা স্পেশালটা তুলে নিতে নিতে বব একটা লাথি কষাল, লয়লার তলপেটে। উঠে দাঁড়াতেই ঠাণ্ডা ভোতা নল স্পর্শ করল ববের পাঁজরে। পরমুহূর্তে আর্তনাদ ও ভারী পতনের শব্দ ও যুগপৎ সাব-মেশিনগানটা অদূরে ছিটকে পড়ার আওয়াজ। ফিরে দেখল ইশাক নীচু হয়ে, তার প্রিয় দামস্কাসের বিশাল খঞ্জের হাতীর দাঁতের হাতলটা ধরে রশীদের বুক থেকে টেনে বের করছে।

বেইরুটের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের লাউঞ্জে বসে বব ভাবছিল চীফ কি ভাবছে তার কেবলটা পেয়ে। বার বার তিনবার ইশাক ওর জন্যই মরতে মরতে বেঁচে গেল আর এইটুকু করবে না, সে। সামনে দীর্ঘ ছায়া পড়তেই মুখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ল দীর্ঘদেহী মাথায় ফেজ টুপি। চোখে কালো গগলস। কিন্তু ছাটা মেহেদী রঙের নূর দাড়ি।

অস্ফুট স্বরে বব বলে উঠল ইশাক্।

হ্যাঁ দোস্ত আবার এলাম, তুমি আমার কাছে না হয় স্বাধীন ভাবে ব্যবসা কর। আমি তোমায় সব কিছু ব্যবস্থা করে দেবো।

সামান্য কটা টাকার জন্য কেন গোলামী করছ। বব্ উঠে দাঁড়িয়ে হাত মিলিয়ে, গভীরভাবে আলিঙ্গন করে গাঢ়স্বরে বলল, আবার দেখা হবে ইশাক। তোমার কথা মনে রাখব। তিব্বতী সাধুদের খোঁজে গিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। লেহ্‌তে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি আবিষ্কার করেতে পেরেছি, তোমার কাছে এসে রশীদ আর আজমল দুই দুর্ধর্ষ এজেণ্টকে চিনতে পারলাম। আর বুঝলাম একটা জায়গাতে দিয়া আর কেজিবি হাত মেলায় সেটা লাল ড্রাগনের বেলায়।

হোটেল প্রাজাতে নিজের কামরায় ঢুকতেই দেখতে পেলো লয়লা বসে আছে, ঠোঁট টিপে হাসছে, ওয়েল কাম ডক্টর নিকোলাই অস্ট্রেভস্কি সরি, বব মুখার্জী অফ এ্যানিম্যাল রিসার্চ সেণ্টার, দিল্লী।

আবার অধিনায়ক গাভাসকার

—বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

গত কয়েক বছরের মতন দেশের মাটিতে এবারকার শীতে টেস্ট ক্রিকেটের কোন আয়োজন হচ্ছে না। ইডেন, চীপক, ওয়াংখেড়েতে বসে খেলা দেখার পরিবর্তে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ভেসে আসা ধারা বিবরণীর জন্য বেতারে কান পেতে রাখতে হবে ক্রিকেট অনুরাগী মানুষদের। কেন না ভারতীয় ক্রিকেট দল পাড়ি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া সফরে অধিনায়কের শিরোপা উঠেছে সুনীল গাভাসকারের শিরে। অধিনায়কের পদে গাভাসকার নির্বাচিত হয়েছেন সর্বসম্মতিক্রমে। বলতে পারি যোগ্য ব্যক্তি প্রাপ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন।

গাভাসকারের কথা আলোচনা করতে বসে ফিরে তাকাতে হচ্ছে ১৯৭০-৭১ মরসুমের ভারতীয় ক্রিকেট দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের দিনগুলোতে। সেবার পোর্ট অফ্ স্পেনে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে গাভাসকারের টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। প্রথম আর দ্বিতীয় ইনিংস মিলিয়ে সুনীল করেছিলেন ৩৩৪ রান। চওড়া ব্যাটের দাপটে ঝলসে দিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে। পোর্ট অফ স্পেন থেকে বম্বের জুবিলী টেস্ট পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বছরের পথ পরিক্রমায় নিত্যনতুন কাহিনী সৃষ্টি করে গাভাসকার হয়ে দাঁড়িয়েছেন ভারতের অপরিহার্য খেলোয়াড়।

ভারতীয় দলে গাভাসকারের স্থান যেমন প্রশ্নাতীত তেমনি সন্দেহাতীত তাঁর অধিনায়ক হওয়া। আজ পর্যন্ত যত ব্যাটস্‌ম্যান ভারতীয় ক্রিকেটে এসেছেন নিঃসন্দেহে গাভাসকার তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ভারতীয় ক্রিকেটের মধ্যে গতি আর সাফল্যের তোলপাড় করে দিয়ে গাভাসকার এনে দিয়েছেন প্রাণের স্পন্দন, নতুন জীবন। ব্যাটের ঝংকারে, কব্জির পেলবতায় ক্রিকেট রসিকদের মন জয় করে নিয়েছেন। এক পা এগিয়ে স্ট্রোক কিংবা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে চোখ ঝলসানো ড্রাইভে রানের মিটার ক্রমাগত বাড়িয়ে গাভাসকার পরিণত হয়েছেন বিশ্বের প্রথম সারির ব্যাটস্‌ম্যানে। বোধহয় সেই কারণেই স্যার গারফিল্ড সোবার্স গাভাসকারকে বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান আখ্যা দিয়েছেন।

ভারতীয় দলের অধিনায়কের পদে গাভাসকারের সাথে দাবিদার ছিলেন একমাত্র গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। একটানা তের বছর টেস্টের অভিজ্ঞতায় বিশ্বনাথ ভারতের অধিনায়ক হয়েছেন মাত্র দুটো টেস্টে। দুটোর একটাতে ড্র এবং দ্বিতীয়টাতে ভারত পরাজিত হয়। অপরদিকে অধিনায়ক হিসেবে গাভাসকারের ভূমিকা অনেক সফল, অনেক প্রশংসনীয়। অধিনায়ক হিসেবে এ পর্যন্ত ১৮টি টেস্টে গাভাসকার জিতেছেন ৬টিতে এবং বাকী ১২টা ড্র করেছেন, একবারও পরাজিত হননি।

গত বছরের প্রস্তাবিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে (পরে বাতিল হয়ে যায়) ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে রাজী না হওয়ায় পাকিস্থানের সাথে শেষ টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। কিন্তু তাইবলে তিনি আবার অধিনায়ক হবেন না এ কথনই হতে পারে না। অবশ্য তা হয়ওনি। ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন ম্যাচ জেতায় আবার হারায়ও। মাঠের মধ্যে ফুটবল বা হকির মতন শুধু প্রতিপক্ষের অধিনায়কের সাথে করমর্দনেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ঝানু ব্যাটসম্যানের মাটি আঁকড়ে থাকার বিরুদ্ধে কোন বোলারকে কি ধরনের বল করতে হবে, ফিল্ডিংয়ের বাঁধুনি কেমন হবে কিংবা টসে জিতে মাঠের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং না ফিল্ডিং কোনটা নিতে হবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে অধিনায়কের ওপর। মোদ্দা কথায় ক্রিকেটে অধিনায়ক একটা মূল্যবান পদ, অধিনায়কত্ব একটা বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্বের মতন। প্রতি পদক্ষেপে বুদ্ধি প্রয়োগ

করে সব কিছুরই খোঁজ রাখতে এবং দৃষ্টি দিতে হয় ক্রিকেটের অধিনায়ককে।

রেকর্ডের দিকে তাকালে গাভাসকারের মত সুন্দর ভূমিকা বিশ্বক্রিকেটে আর কোন ভারতীয় ক্রিকেটারের নেই বললেই চলে। ১৯৭০-৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক সিরিজেই রান এবং গড়ে তিনি তৈরি করেছিলেন বিশ্বরেকর্ড। টেস্ট অভিষেকের সিরিজে আজ পর্যন্ত কেউই গাভাসকারের মতন অত রান এবং গড় তৈরি করতে পারেন নি। গাভাসকার করেছিলেন ৭৭৪ রান, গড় ছিল ১৫৪·৮০। তিনবার দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী করার যে বিশ্ব রেকর্ড আছে তা গাভাসকারেরই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭০-৭১ সালে পোর্ট অফ স্পেন টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১২৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২২০, ১৯৭৮ সালে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে করাচী টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১১১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৭ এবং ১৯৭৮-৭৯ মরসুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টে প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১০৭ ও ১৮২। আজ পর্যন্ত একই ম্যাচে একটা সেঞ্চুরী এবং ডবল সেঞ্চুরী করার বিশ্বরেকর্ড যে চারজন করেছেন তাঁদের মধ্যে গাভাসকারও একজন। ৭০-৭১ সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পোর্ট অফ স্পেনে ১২৪ ও ২২০ রান করে গাভাসকার ঐ কৃতিত্ব অর্জন করেন। গাভাসকার ছাড়া আর যে তিনজন ঐ কীর্তি গড়েছেন তাঁরা হলেন কে. ডি. ওয়ালটার্স (অস্ট্রেলিয়া), লয়েন্স রো (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), এবং গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া)।

টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয়দের যে রেকর্ড আছে তাতেও গাভাসকারের ভূমিকা সবচেয়ে উজ্জ্বল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৯৭৯ সালে ইংল্যাণ্ডের সাথে ওভালে একদিনে গাভাসকারের ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসা ১৭৯ রান। ইংল্যাণ্ডের সমস্ত বোলারকে তিনি মেরে ছারখার করে দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের দর্শকদের চোখ ঝলসে দিয়েছিলেন মাঠের দীপ্ততে, শিল্পের বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়েছিল ওভালের সবুজ মাঠের চারপাশে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ক্রিকেট-খেলুড়ে দেশের বিরুদ্ধে এক এবং একাধিক সেঞ্চুরী, তিনটে ক্যালেণ্ডার ইয়ারে তিনবার এক হাজার রান পূর্ণ, একমাত্র ভারতীয় হিসেবে তিনটে ডবল সেঞ্চুরী ইত্যাদি বহু রেকর্ড গাভাসকার নিজের ঝুলিতে পুরে নিয়েছেন।

রান আহরণের দৌড়ে গাভাসকার সোবার্স (৮,০৩২), কাউড্রে (৭,৬২৪), হ্যামণ্ড (৭,২৪৯), বয়কট (৭,১১৫), ব্র্যাডম্যান (৬,৯৯৬), হাটন (৬,৯৭১), ব্যারিংটন (৬,৮০৬), রোহন কানহাই (৬,২২৭) এবং হার্ভে (৬,১৪৯) পশ্চাৎযাত্রী। এযাবৎ ৬০টি টেস্টে গাভাসকার করেছেন ৫,১৭৪ রান। রানে সোবার্স আর সেঞ্চুরীতে ব্র্যাডম্যানকে টপকে যেতে পারলে রান আর সেঞ্চুরীর রাজটিকা গাভাসকার ললাটে পরতে পারেন। রানের বিরাট সংগ্রাহক হয়েও গাভাসকারের ব্যাট কখনও নীরস যান্ত্রিকরূপ ধারণ করেনি। যেখানেই গাভাসকার খেলেছেন সে সমস্ত জায়গার দর্শকরাই রোমাঞ্চিত হয়ে গেছেন, আনন্দের জোয়ারে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। শুধু ভারতীয়রাই নয় ক্রিকেট পিপাসু দেশের মানুষেরাই অন্তরের আবেগে আনন্দের রসে অভিষিক্ত করেছেন গাভাসকারের ব্যাটের বর্ণালী ক্রিকেটকে।

ভারতীয় ক্রিকেটে যাঁর এত কীর্তি তাঁর কাঁধে অধিনায়কের দায়িত্ব সঁপে দেওয়া যথার্থই কাজ। ব্যাটসম্যান হিসেবে সুনীল যেমন কীর্তিময় তেমনি সফল অধিনায়ক হিসেবে। ১৯৭৮-৭৯-তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যখন ডবল্ সেঞ্চুরীর জন্য আর মাত্র ১৮ রান দরকার অর্থাৎ সুনীল ১৮২তে দাঁড়িয়ে তখন হঠাৎই অধিনায়ক এবং ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে মহত্বের পরিচয় দিয়ে গেলেন নট আউট অবস্থায় প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়ে।

এইবারই প্রথম গাভাসকার বিদেশে অধিনায়কত্ব করছেন। এর আগে ১৯৭৫-৭৬ মরসুমে তৎকালীন অধিনায়ক বেদীর অসুস্থতার জন্য অকল্যাণ্ড টেস্টে গাভাসকারকে অধিনায়কত্ব করতে হয়। সেই প্রথম ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন। এরপর পাকাপাকিভাবে অধিনায়কের পদে আসীন হয়ে মোট ১৭টি টেস্ট খেলেন এবং প্রত্যেকটা টেস্টই স্বদেশে অনুষ্ঠিত হয়। অধিনায়ক হিসেবে ১৮টি টেস্টে গাভাসকার করেছেন ১,৮৬০ রান, গড় ৭৭·৫০।

অস্ট্রেলিয়া সফরে গাভাসকারকে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া তাঁর যোগ্যতাকেই স্বীকৃতি জানানো। কেননা ভারতীয় দলের অধিনায়কের পদে এই মুহূর্তে গাভাসকারই যোগ্যতম ব্যক্তি। অধিনায়কের শিরোপা একমাত্র তিনিই শিরে পরতে পারেন।

হীরে উধাও রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট মাসীর বাড়ির ছাদে দারুণ এক পিকনিক হলো লক্ষ্মীপুজোর রাত্তিরে। প্রত্যেক বছরই হয় এরকম, তবে এবছর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের ছোট মামা আসায় আরও জমে গিয়েছিল। ছোটমামা খুব মজার গল্প বলতে পারেন।

ছোট মাসীর বাড়ির ছাদটা প্রকাণ্ড। তার একটা কোণ তেরপল দিয়ে একটুখানি ঘিরে দিয়ে সেখানে পাতা হয় ইটের উনুন। আর ছাদের অন্য দিকে সতরঞ্চি পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে গান বাজনা আর আড্ডা। সে রাতে কিন্তু কোনো আলো জ্বালা হয় না। কোজাগরি পূর্ণিমায় এমন জ্যোৎস্না থাকে যে তখন অন্য কোনো আলো জ্বাললেই বিচ্ছিরি দেখায়। আর সেই জন্যই তো ছাদে পিকনিক। প্রায় তিরিশ পঁয়তিরিশ জন এসেছিল সেই পিকনিকে। ছোট মাসীর দুই মেয়ে হাসি আর খুশীর সাত আটজন বন্ধু। ওদের ভাই বাবলুর চার পাঁচজন বন্ধু। বড় মাসী আর সেজো মাসীর ছেলেমেয়েরা। অর্থাৎ ছোটরাই বেশী। ছোটমাসী আর ছোটমামার চেনাশুনো কয়েকজন এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে আমি চিনতাম না আগে।

দু'তিনজন কাজের লোকের সাহায্য নিয়ে রান্নার দিকটা সামলাচ্ছেন আমাদের বড়মাসী। তাঁর হাতের রান্না চিংড়িমাছের মালাইকারি যে একবার খেয়েছে সে আর জীবনে ভুলবে না।

ওদিক থেকে রান্নার চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে, আর এ পাশে জমে উঠেছে আনন্দের আড্ডা।

প্রথমে হাসি আর খুশী আর তার বন্ধুরা কয়েকখানা গান শোনালো কোরাসে। ছোটমামার এক বন্ধু সুজিতবাবু ম্যাজিক দেখালেন কয়েকটা। অদ্ভুত ম্যাজিক জানেন তিনি। একেবারে খালি হাত, কোনো যন্ত্রপাতি নেই, এক জায়গায় বসে বসে তিনি অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দেখাতে লাগলেন। রান্নার জায়গা থেকে দুটো ডিম আনতে বলে তিনি সেই ডিম দুটো তার সামনে রেখে রুমালে ঢেকে দিলেন। একটু বাদেই রুমাল তুলে নিতেই দেখা গেল ডিমের বদলে সেখানে রয়েছে একদম বা[illegible] দুটো মুর্গীর ছানা। আবার সে দুটোকে রুমালে ঢে[illegible]মাদের জিজ্ঞেস করলেন। এখন এখানে কী আছে?

আমরা সবাই বললুম, মুর্গীর ছানা।

উনি বললেন, ঠিক ? আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে যে-কোনো একজন রুমালটা তোলো।

খুশী রুমালটা তুলেই বলে উঠলো, ও মা !

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, মুর্গীর ছানা নেই, সেখানে ডিম দুটো আবার ফিরে এসেছে !

আরও কতসব চমকানো খেলা। তার মধ্যে আর একটা খেলাতে আমি খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলুম।

একটা দশ টাকার নোট অনেকগুলো ভাঁজ করে সুজিতবাবু ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, যাঃ !

নোটটা আর নিচে পড়লো না। কী যে হলো, কেউই বুঝতে পারলুম না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টাকাটা কোথায় গেল ? একেবারে উড়িয়ে দিলেন।

শুরু করেছেন, অমনি বড়মাসিমা এসে তাড়া দিলেন, এবার খেতে বসো সবাই, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খাবার ! তা ছাড়া একটু বাদে মাথায় হিম পড়বে !

খবরের কাগজ পেতে বসা আর কলাপাতায় খাওয়া। এক ব্যাচে হলো না, দু' ব্যাচে। ভাত, নারকেল দিয়ে রান্না মটর ডাল, বেগুন ভাজা, ডিম ভাজা আর চিংড়িমাছের মালাইকারি। কী অপূর্ব যে খেতে লাগলো কী বলবো ! খেতে খেতে সিদ্ধার্থ নামের একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো, থ্রি চিয়ার্স ফর বড়মাসি·· হিপ্···হিপ্···। সবাই বললো হু-র-রে ! তারপর ছোটমাসীর নামেও থ্রি চিয়ার্স দেওয়া হলো।

প্রথম ব্যাচ খাওয়া শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় ব্যাচ সবেমাত্র বসেছে, আমার ওপর পড়েছে পরিবেশন করার ভার, এই

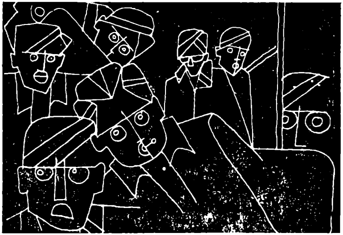

সুজিতবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে ? তুমিই তো টাকাটা নিলে ! ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখো— ।

সত্যিই আমার পকেটে সেই ভাঁজ করা দশ টাকার নোটটা। সবাই হাসতে লাগলো আমার দিকে চেয়ে।

আমি সুজিতবাবুর থেকে অনেকটা দূরে বসেছিলাম। তবু ঐ টাকাটা আমার পকেটে গেল কী করে ? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি ?

ম্যাজিকের পর হলো ধাঁধা, তারপর মেমারি গেম, তারপর আবার গান। শেষকালে ছোটমামা সেই অস্ট্রেলিয়ার গল্প

সময় একটা কাণ্ড হলো।

কোথা থেকে ছাদে উঠে এলো একটা কুকুর।

যা তা নেড়িকুত্তা নয়, বড় বড় লোমওয়ালা একটা সাদা কুকুর, অনেকটা জার্মান স্পিৎস্ ধরনের। কুকুরটা ছাদে উঠে এসেই দারুণ জোরে দৌড়োতে লাগলো এদিক ওদিকে। সবাই এ কি, এ কি বলে উঠে দাঁড়ালো।

ছোটমাসীর সাঙ্ঘাতিক কুকুরের ভয়। যত ছোট কুকুরই হোক না। ছোটমাসী একদম কুকুর সহ্য করতে পারেন না। ছোটমাসী উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় নাচের মতন তিড়িং

বিড়িং করে লাফিয়ে বলতে লাগলেন, ওমা, একি! একি! এটা কোথা থেকে এলো রে!

ছোটমাসীর মেয়েরা কিন্তু কুকুরকে ভয় করে না। হাসিই ধরে ফেললো কুকুরটাকে। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বললো, বাঃ, কী সুন্দর কুকুরটা! কাদের এটা!

এ বাড়িতে কুকুর নেই। সত্যি, কোথা থেকে এলো?

ছাদের কার্নিশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখা গেল যে রাস্তায় একজন বুড়ো মতন লোক একটা চেন হাতে নিয়ে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। কুকুরটা নিশ্চয়ই ওঁরই। কোনো রকমে চেন ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে। একজন নিচে গিয়ে কুকুরটা ফেরত দিয়ে এলো।

যাক্, বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। কুকুরটা দুটো কলাপাতা মাড়িয়ে দিয়েছিল। সে দুটো বদলে দিয়ে আবার খেতে বসলো দ্বিতীয় ব্যাচ।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ছোটরা প্রায় সবাই চলে গেল। বড়রাও গেছে অনেকে। আমরা সাত আটজন তখনও বসে ছোটমামার কাঁকড়া ধরার গল্প শুনছি, এমন সময় হঠাৎ ছোটমাসী বলে উঠলেন, এ কী, আমার নাকছাবি?

ছোটমাসী সেদিন নাকে একটা সুন্দর হীরের নাকছাবি পরেছিলেন, আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। এখন সেটা নাকে নেই!

ছোটমামা বললেন, নিশ্চয়ই এখানে কোথাও খুলে পড়েছে, খুঁজে ভাখ্!

বড়মাসী বললেন, কুকুরটা দেখে তুই যেমন তিড়িং বিড়িং করে লাফালি, তাতে নাকছাবি খুলে পড়বে, সেটা আর আশ্চর্য কী!

এবার আর জ্যোৎস্নার আলোয় ওপর ভরসা করা যায় না। খুশী দৌড়ে নিচ থেকে নিয়ে এলো টর্চ। ছোটমাসী যেখানে বসে ছিলেন সেখানে খুঁজে দেখা হলো। হীরের নাকছাবি সেখানে নেই।

আরও টর্চ আনা হলো, জ্বেলে দেওয়া হলো ছাদের আলো। সবাই মিলে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু সেটা পাওয়া গেল না।

ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, তুই এর মধ্যে নিচে গিয়েছিলি? মনে করে ভাখ তো!

ছোটমাসীর স্বভাব খুব ছটফটে। এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেন না। আমি যতবারই এ বাড়িতে এসেছি, ততবারই দেখেছি যে ছোটমাসী চটি পায়ে দিয়ে ফটফটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়ি। ছোটমাসীর দারুণ বাতিক-বাতিক। কিছু একটাতে হাত দিলেই অমনি হাত ধোওয়া চাই। তাঁর চটিও অনেকগুলো। রান্নাঘরের চটি, শোবার ঘরের চটি, ছাদের চটি—সব আলাদা আলাদা।

কিন্তু আজ ছোটমাসী অন্তত দু'ঘন্টার মধ্যে নিচে যাননি, সবাই বললো। হাত ধুয়েছেন মোটে তিনবার। ছাদেই একটা কল আছে, সেখানে। তবে কি হাত ধোওয়ার সময় নর্দমা দিয়ে জিনিসটা চলে গেল? সেখানটায় খোঁজা হলো ভালো করে। নর্দমার ঝাঁঝরিতে শ্যাওলা জমে আছে, জল যাচ্ছে আস্তে আস্তে, সেখান দিয়ে একটা নাকছাবি চলে যাবে, এমন বিশ্বাস হয় না।

ম্যাজিশিয়ান সুজিতবাবু বললেন, কিন্তু যখন কুকুরটাকে দেখে আপনি নাচলেন, তখন আপনার নাকে নাকছাবি ছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি। আমার একটু খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু ভেবেছিলাম, আপনি নিজেই খুলে রেখেছেন।

হাসি আর খুশী বললো, কিন্তু মা, মেমারি গেমের সময় যখন তুমি হেরে গিয়ে খুব হাসছিলে, তখন তোমার নাকে ওটা চকচক করছিল, আমরা দেখেছি। তারপর তো তুমি আর নিচে যাও নি!

ছোটমাসী হঠাৎ বড় বড় চোখ মেলে সুজিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ওটা লুকিয়ে রেখেছেন, তাই না!

সুজিতবাবু বললেন, আরে না, ওরকম প্র্যাকটিক্যাল জোক্ আমি করি না।

সবাই মিলে সুজিতবাবুকে চেপে ধরা হলো, তিনি বারবার ঐ কথাই বলতে লাগলেন।

তখন ছোটমাসী বললেন, আপনি ম্যাজিক জানেন, আপনি ওটা খুঁজে বার করে দিন। জিনিসটা আমার খুব প্রিয়…।

সুজিতবাবু বললেন, সে ক্ষমতা আমার নেই। সবাই যেমন খুঁজছে, আমিও সেই রকমই খুঁজছি। পেলাম না তো!

With best compliments of :

M/s. EASTERN ENGINEERING WORKS

ENGINEERS, MANUFACTURERS & GENERAL MERCHANTS

We are the Registered Suppliers of the following Government Sectors

1. **Steel Authority of India Ltd.**
   Rourkela Steel Plant,
   Rourkela.

2. **Steel Authority of India Ltd.**
   Alloy Steels Plant,
   Durgapur.

3. **Steel Authority of India Ltd.**
   Durgapur Steel Plant,
   Durgapur.

4. **India Iron & Steal Co.**
   Burnpur.

5. **Steel Authority of India Ltd.**
   Bhilai Steel Plant,
   Bhilai.

606, RABINDRA SARANI,
CALCUTTA-700 005

Works :

এঁটো কলাপাতাগুলো বাইরে ফেলা হয়নি, ছাদের এক কোণে জড়ো করা ছিল, তার প্রত্যেকটি আবার উলটে-পালটে ভালো করে দেখা হলো। খবরের কাগজ, সতরঞ্চি—কিছুই দেখা বাদ রইলো না।

ছাদের নর্দমাটার ঝাঁঝরি খুলে, সেখানে এক বালতি জল ঢেলে, নিচে যেখানে জলটা পড়ে সেখানেও দেখা হলো সবাই মিলে। নাকছাবিটা নেই।

রাত বারোটার সময় ছোট মেসোমশাই বললেন থাক, আর খোঁজবার দরকার নেই, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

পরদিন সকালেই আমি এলুম আবার ছোটমাসীর বাড়িতে। ছোটমাসীর মুখে একটা কান্না কান্না ভাব। নাকছাবির হীরেটার দাম দু' হাজার টাকার বেশী। শুধু সে জন্য নয়, ওটা ছোটমাসীকে দিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি, সেই জন্যই ওটার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সেইজন্যই ছোটমাসী ওটার দুঃখ ভুলতে পারছেন না।

আমি বললুম, ছোটমাসী পুলিসে খবর দেবে নাকি?

ছোটমাসী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, না, থাক্। সবাই চেনাশুনো···

অর্থাৎ পিকনিকে যারা এসেছিল, তারা সবাই চেনাশুনো, তাদের মধ্যে যদি কেউ নিয়ে থাকে কিংবা ইচ্ছে করে লুকিয়েও রাখে, তা হলেও তাদের কাছে পুলিসে গিয়ে ঝামেলা করবে, এটা ঠিক নয়।

একটু বাদেই এসে হাজির হলেন ছোটমামা।

তিনি বললেন, আমি কাল রাত্তিরে অনেক ভাবলুম, বুঝলি? কে নিতে পারে? ছোটরা কেউ নেবে না, তারা বাদ!

আমি বললুম কেন। ছোটরা কেউ নিতে পারে না কেন? ছোটরা বুঝি সবাই সাধু?

ছোটমামা বললেন, ছোটরা অন্য কোনো জিনিস হলেও নিতে পারতো। কিন্তু একটা নাকছাবি নিয়ে কী করবে? কোনো বাচ্চা মেয়ে আজকাল নাকছাবি পরে না। আর ছোট ছেলেরা কেউ পেলে তক্ষুনি ফিরিয়ে দিয়ে কৃতিত্ব নিত। যাই হোক, বড়দের মধ্যে রইলুম আমরা সাত আটজন। তোর সবচেয়ে বেশী সন্দেহ হয় কাকে বল্ তো?

আমি বললুম, যাই বলো, ছোটমামা, ঐ ম্যাজিসিয়ান সুজিতবাবুকেই আমার সন্দেহ হয়।

ছোটমামা হাসতে হাসতে বললেন, আর ঐ সুজিত আমায় সকালে টেলিফোনে কী বললো জানিস? সুজিত বললো, তার সন্দেহ হয় তোকে!

—আমাকে?

—হ্যাঁ!

ছোটমাসী বললেন, নীলুকে সন্দেহ? তুমি কী যা তা বলছো ছোড়দা?

ছোটমামা বললেন, বাঃ, নীলুর পকেট থেকে সেই দশ টাকার নোটটা পাওয়া গিয়েছিল না।

আমি বললুম, ছোটমামা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। তোমার ঐ বন্ধুকে সাবধান করে দিও! ওসব ম্যাজিসিয়ান ফ্যাজিসিয়ানদের আমি গ্রাহ্য করি না!

ছোটমামা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, তুই অত রাগছিস কেন? ও কি সত্যি তোর নামে দোষ দিয়েছে নাকি? আমি এমনি বানিয়ে বললুম! ঐ সুজিত কিন্তু শুধু ম্যাজিশিয়ান নয়। ও একজন বড় এঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিক দেখানো ওর শখ। ও কেন একটা হীরের নাকছাবি নিতে যাবে? সুজিত সত্যি সত্যি আমাকে আজ সকালে যা বললো টেলিফোনে, তা শুনবি?

—শুনি?

—তার আগে দেখা যাক্, আর কে কে নিতে পারে। নীলু নেয় নি। আমি নিইনি। বড়দি মেজদিদের তো কথাই ওঠে না। তোর বরই বা নেবে কেন? রতন আর প্রিয়ব্রত আগে আগে খেয়ে চলে গেছে, তারপর মেমারি গেম হয়েছিল। সুতরাং ওরাও নিতে পারে না। তা হলে বাকি রইলো ঐ সাদা কুকুরটা!

ছোটমাসী বললো, একটা কুকুর নাকছাবি নিয়ে যাবে? যত সব পাগলের মতন কথা!

ছোটমামা বললেন, কুকুরটা নেবে না বলছিস? তা হলে আর বাকি রইলি তুই! সুজিতও সেই কথাই বলেছে। তোর নাকছাবি তুই চুরি করেছিস!

ছোটমাসী চোখ কপালে তুলে বললেন, আমি করবো

প্রফেসর্স করেসপণ্ডেন্স কলেজ

- মাধ্যমিক থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার গ্যারান্টিযুক্ত নোটস্ এবং নির্ভরযোগ্য সাজেশান দেওয়া হয়।

- এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওল্ড কোর্সে গ্র্যাজুয়েট হবার শেষ সুযোগ। একচান্সে নিশ্চিত সাফল্যের জন্য দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে।

- স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রুপ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার ক্লার্ক, টাইপিস্ট ইত্যাদি নেওয়া হ'চ্ছে। পূর্ণাঙ্গ গাইডেন্স আর উঁচুমানের কোচিং (ডাকযোগে) দেওয়া হ'চ্ছে।

এবং

প্রতি বুধবার নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

অভিজ্ঞতাহীন তরুণ-তরুণীদের জন্য

চাকরি বিষয়ক সাপ্তাহিক

কাজের কথা

প্রতি সংখ্যা : ২৫ পয়সা : সডাক গ্রাহক চাঁদা : ৬ মাস ৬ টাকা : ১ বছর ১২ টাকা

কাছাকাছি ষ্টলে বা হকারের কাছে খোঁজ করুন

সমস্ত শহরে এজেন্সি দেওয়া হচ্ছে

যোগাযোগ : প্রফেসর্স করেসপণ্ডেন্স কলেজ, ১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি-১২

আমার নিজের জিনিস চুরি ? ভদ্রলোক গাঁজা খান বুঝি ? —তুই ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করতে পারিস !

—আমার আর খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ নেই ? শোনো ছোড়দা, তোমার ঐ ম্যাজিক দেখানো বন্ধু যেন আর কো দিন আমাদের এ বাড়িতে ঢোকে ! তা হলে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেবো !

—আহা অত চটে যাচ্ছিস কেন ? তুই লুকোস নি তা হলে, এই তো ? তা হলে অন্য কেউ না কেউ লুকিয়েছে। দেখিস, দু' এক দিনের মধ্যেই ফেরত দিয়ে যাবে।

এরপর সাতদিন কেটে গেল। কেউ সেই নাকছাবি ফেরত দিল না। দিনের আলোয় ছাদটা খুঁজে দেখা হলো অনেকবার। সেটা যেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পরের সাতদিনেও কেউ ফেরত দিল না। তারপরের সাতদিনেও না। অনেকে ব্যাপারটা ভুলেই গেল।

মাসখানেক বাদে একদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ছোটমাসীর হঠাৎ খুব রাগ হলো। মনে পড়ে গেল সেই ম্যাজিসিয়ান সুজিতবাবুর কথা। লোকটা কেন বললো, আমার জিনিস আমি নিজেই লুকিয়ে রেখেছি ? ও কি বলতে চায়। মনের ভুলে ওটা খুলে আমি কোথাও রাখবো ?

ধড়মড় করে ওঠে পড়ে ছোটমাসী আলমারি খুললেন। যেখানে গয়না থাকে সেখানটায় খুঁজে দেখলেন আবার। আগেও অনেকবার দেখেছেন। সেখানে থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া হাসি আর খুশী জোর দিয়ে বলেছে, ওটা মেমারি গেমের সময় মায়ের নাকে দেখেছিল। তারপর ছোটমাসী আর নিচে নামেন নি।

তা হলে কি মনের ভুলে ছাদেই কোথাও ওটা রেখে দিয়েছেন ? তা ও তো অসম্ভব। সারা ছাদ কতবার দেখা হয়েছে তার ঠিক নেই !

মনটা খারাপ হয়ে গেল ছোটমাসীর। আর ঘুম আসছে না। তিনি একা একা উঠে এলেন ছাদে।

আজও উঠেছে সুন্দর জ্যোৎস্না। এখন অনেক রাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একা একা ছাদে ঘুরতে ছোটমাসীর বেশ ভালোই লাগছে।

হঠাৎ এই সময় ভূতে ধাক্কা মারলো তাঁকে।

ওগো, মা গো বলে, চিৎকার করে দড়াম শব্দে পড়ে গেলেন ছোটমাসী। ভাবলেন, বুঝি ভূতে তার গলা টিপে মেরে ফেলবে।

কিন্তু আর কিছুই হলো না। ছোটমাসীর চিৎকারও কেউ শুনতে পায়নি। পা থেকে একপাটি রবারের চটি ছিটকে গেছে দূরে। আস্তে আস্তে উঠে বসতেই একটা ঝকঝকে জিনিসে তাঁর চোখ আটকে গেল। জিনিসটা পড়ে আছে তাঁর পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই দেখলেন, সেই হীরের নাকছাবি !

তবে কি ভূত এসে একমাস বাদে এই নাকছাবিটা উপহার দিয়ে গেল ?

কী করে ছোটমাসী ঐ ভাবে রাত্তিরবেলা হীরের নাকছাবিটা ফিরে পেলেন, সেটা যদি আমি না বলে দিই, তোমরা পাঠক-পাঠিকারা পারবে সেই রহস্যের সমাধান করতে ?

একটু ভেবে ভাখো। উত্তর অন্য পাতায়।

(৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ পূজার প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ

১লা ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৬ই ডিসেম্বর করা হইল।

হীরে উধাও রহস্য (২৯ পাতার পর)

- উত্তর

ছোটমাসীর হীরের নাকছাবিটা কোনো এক সময় খুলে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের রবারের চটিতে গেঁথে গিয়েছিল। সেইজন্য সবই খুঁজে দেখা হয়েছে, শুধু নিজের পায়ের চটি উলটে দেখা হয়নি। ছাদের চটি যে-হেতু আলাদা, তাই ওটা ছাদেই সিঁড়ির পাশে রাখা থাকে, সব সময় ব্যবহার হয় না। একলা ছাদে এসে ঘুরবার সময় হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই চটির তলা থেকে হীরের নাকছবিটা খুলে বেরিয়ে আসে।

With Best Compliments From :

The General Industrial Society Ltd.

9, India Exchange Place.

CALCUTTA.

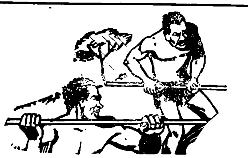

গ্রামের নাম লেঠেলবাড়ি

নবনীতা দেব সেন

রাজু থাকতো বনগাঁর দিকে একটা গ্রামে আর কেবলই বলতো, "চল্ একবার আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে যাবি। কী সুন্দর ইচ্ছামতী নদী, কী সুন্দর কাঞ্চন ফুলের গাছ, কী সুন্দর পুরোনো দুর্গাবাড়ি।—চণ্ডীমণ্ডপ ওলা ভালো জমিদারবাড়ি দেখে তোরা চোখ ফেরাতে পারবি না।" সেবার পুজোর ছুটিতে সত্যি সত্যি চললুম সবাই মিলে রাজুর বাড়ি। স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে বেশ অনেকটা যেতে হয় ভেতর দিকে, রিকশা-টিকশা নেই। রাজুদের গ্রামের নাম কদমতলা। সত্যিই, ওদের গ্রামটা খুবই সুন্দর। যা বলেছিল ঠিক তাই। আমরা মোট চারবন্ধু গেছি রাজুসুদ্ধ। সেখানে গিয়ে দলে জুটলো পাঁচ নম্বর। রাজুর খুড়তুতো ভাই সঞ্জু, আই আই টি থেকে এসেছে। সঞ্জু বলল—"আরো সুন্দর সুন্দর কতই গ্রাম আছে ভিতর দিকে। ওই ক্যানাল দিয়ে ডিঙি করে যদি যাওয়া যায়, দেখবি একটুও সহুরে ভাব নেই—একদম 'ইনটিরিয়ার ভিলেজ' যাকে বলে।" সত্যিই একটি ক্যানাল আছে, গ্রামের মাঝখান দিয়ে বহুদূর অবধি চলে গেছে, কে জানে কোথায়। ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, জোয়ারভাঁটা খেলে। একটি ডিঙি বাঁধা থাকে গ্রামের ঘাটে। একদিন তাতে করে ভেসে চললুম আমরা পাঁচজনে, ভেতরদিকের আরো গভীর গ্রাম দেখতে। সঞ্জীব আর রাজীব তো গ্রামের ছেলে, ওরা ডিঙি বাইতে ওস্তাদ। আমরা তিনজন হাঁদারাম হলেও চটপট শিখে নিলুম কায়দা-কানুন, যাতে কারুকেই বেশিক্ষণ ডিঙি বাইতে না হয় খালটা প্রথমে জমির সমান সমানই চলছিল। ক্রমশ জমি দুপাশে ঠেলে উঠতে লাগলো ওপরদিকে, খালটার জলের লেভেল নামতে লাগলো নিচে। একসময় মনে হল যেন খাদের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। উপরে বাড়িঘর, গাছপালা, ঘাস, ধান, তারও ওপরে আকাশ। এমন একটি জায়গায় সন্ধ্যা হল। সঞ্জু রাজু থামলো। সেখানে একটা ঘাটলামতন জায়গা ছিল, ডিঙি বাঁধবার। আর উঁচু ডাঙার গায়েই মাটি কেটে কেটে সিড়ির মতন করা আছে। আমরা ওপরে উঠে এসে দেখি একটু দূরেই ভীড়। গ্রামের হাট বসেছে। হাট বসেছে ঠিক নয়, হাট উঠে যাচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে। লোকজন ঘরে ফিরছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখি সবাই দোকান তুলে ফেলেছে। একজন লোক দুটো মুরগী ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, দেখেই আমি বলে ফেললুম—"বিক্রি করবেন নাকি"? (গৌতম দারুন মুরগী রাঁধে। সেটাই এই আকুল প্রশ্নের কারণ।) লোকটা দশটাকাতেই মুরগীদুটো বেচে দিল। হাট ভেঙে গেছে, মুরগী বিক্রি হয়নি, এমন সময়ে লক্ষ্মীলাভ, সে তো মহাখুশি। গৌতম ঠোঁট উলটে বলল—"বেশ তো হল। এখন রাধবি কোথায়? কী দিয়েই বা রাধবি? মশলাপাতি, বাসনপত্র, উনুন, কিছুই তো নেই। খাবিই বা কী দিয়ে? ভাত কই! পাগল নাকি তোরা?" সত্যিই তো, মনখারাপ করে বড় গাছটার তলায় বসে পড়লুম আমরা। দূরে মাঠের এক ধারে আকাশ লাল করে সূর্য অস্ত গেছেন। সেদিকে চেয়ে বাপি যেই গেয়ে উঠেছে "দিন শেষের রাঙা মুকুল"—"চুক্কর্!" বলে তাকে হঠাৎ থামিয়ে দিল রাজু।—"সঞ্জু তোদের আরো

ভালো গ্রাম দেখাতে এসেছে, এখন ব্যবস্থাটা সেই করুক। আমি কিছু জানিনা।" আমি ততক্ষণে হাটের, ক্যানালের সূর্যাস্তের অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলেছি পটাপট্। গৌতম তার টেপরেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়েছে। রুনা লায়লার গান হচ্ছে ক্যাসেটে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।—সঞ্জু গটমট করে এগিয়ে গেল বাপিকে সঙ্গে নিয়ে। রাজুকে নিলনা। ঘরটরের সন্ধানেই গেল বোধ হয়। এমন সময়ে একটি মাঝবয়সী লোক, বেশ ভদ্র চেহারা, ফর্সা গেঞ্জী আর নীল চেক লুঙ্গি পরা। চোখে নিকেলের চশমা, এগিয়ে এসে বললে "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" দুমিনিটেই রাজু আর গৌতমের সঙ্গে তার ভীষণ ভাব হয়ে গেল। একটু পরেই রাজু এসে আমাদের গোপনে ডেকে বললো 'চল, আমরা ওঁর ওখানে যাই। সঞ্জু-বাপির দ্বারা কিছু হবে না। উনি নিজেই বলছেন আমাদের একটা ঘর দেবেন, রান্নার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আমাদের টেপে রুনা লায়লা শুনে, গানের টানেই এসেছেন। গান বাজনা দারুণ ভালবাসেন। মানুষটি ভাল বলেই বোধ হচ্ছে। আমাদের ওদিককার বি. ডি. ওকে চেনেন, তার বন্ধু বলে পরিচয় দিলেন। যাবি নাকি?' এমন সময়ে সঞ্জু-বাপি ফিরল, ক্লান্ত বিরক্ত চেহারা।—"এ গাঁয়ের লোকগুলো সব কেমন জানিনা।" বাপি বলল, "উঃ!—কেউ কথাই কইতে চায় না। কী হস্টাইল অ্যাটিচ্যুড!"

"যাদের সঙ্গেই কথা কইতে যাই সেই কাটিয়ে দেয়। বাড়িতে ঠাঁই দেবে কি! চোখভর্তি সন্দেহ নিয়ে চেয়ে আছে, আমরা যেন চুরি ডাকাতি করতে এসেছি।"

"বাবারে বাবা। ও খাওয়া দাওয়া আর আজ হবে না —এই পাঁউরুটি আর গুড় কিনে এনেছি তাই খেয়ে—"

—"আপনারা এই অধীনের বাড়িতে পদধূলি দিলে আমি কৃতার্থ হব"—বলে এগিয়ে গেলেন সেই ভদ্রলোক।— "অধমের নাম শ্রীনরহরি দাস। আমার একটি মুদির দোকান আছে। আমার বাড়িতেই আপনাদের দুটো ভাত ফুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব। দয়া করে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন।"

অবাক সঞ্জুর দিকে বিজয়গর্বে তাকিয়ে রাজু বলল— "চল্ চল্। এদিকে ইনটিরিয়ার ভিলেজ দেখানোর শখ আছে, অথচ ওদিকে তার ব্যবস্থা করবার সামর্থ্য নেই। দূর! আই আই টির ছেলেগুলো এমনিই হয়।" আমরা সব যাদবপুরের ছাত্র। অন্য সব কলেজকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি। সঞ্জু রাজুর সঙ্গে রেষারেষি আছে এনিয়ে। সঞ্জু বেচারী কিছু বলতে পারল না।

নরহরিবাবু খুব যত্ন করলেন। মাংস রাঁধলেও বটে গৌতম। মশলাপাতি সব যোগালেন, বাটনা বেটে দিলেন নরহরিবাবুর স্ত্রী; ভাতটাও তিনি রেঁধে যত্ন করে বেড়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ বললেন—"রাত ন'টায় একটা বাস আছে বনগাঁর—সেটা ধরে এবার চলে যাওনা বাবারা? বেড়ানো তো হলো, কেমন? রাতে বড্ড মশা, কতরকম পোকা-মাকড়, সাপখোপ বেরোয়, গাঁঘরের ব্যাপার। তোমাদের দেবার মতন মশারীও নেই।" যদিও পাঁচজনকে তিনটে মাদুর পেতে দিয়েছেন মাটির বারান্দায়।

খুব নরমসরম মিষ্টি মহিলাটি, মায়ের মতন। খেয়েদেয়ে মাদুরে শুয়ে হাতপা ছড়িয়ে রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে এত আরাম হচ্ছিল যে তক্ষুনি ছুটতে ছুটতে বনগাঁর বাস ধরবার ভাবনাটা খুবই বিচ্ছিরি লাগলো। নরহরিবাবুর স্ত্রীকেও খুবই আশ্চর্য মহিলা মনে হল। এতক্ষণ এত যত্ন করে, কী করেই বা হঠাৎ বলছেন চলে যেতে? এত রাত্রে? বনগাঁ পৌঁছুতে রাত ১১টা হয়ে যাবে। তখনই বা আমরা কোথায় যাব? নরহরিবাবু খুব ভাল লোক। আমাদের শোবার বন্দোবস্ত নিজেই করলেন। ঘরে তোষক বালিশ টানাটানি করছেন দেখেছি। তিনি একটু আড়াল হতেই তাঁর স্ত্রী এরকম কথা বলছেন, আশ্চর্য!

ঘরে বিছানা পেতে দিয়ে লণ্ঠন কমিয়ে দোরের কাছে রেখে, পেতলের ঘটি করে খাবার জল নিয়ে এলেন নরহরিবাবু। তাঁর স্ত্রীকে আর দেখা গেল না। নরহরিবাবু এবার আমাদের কাছে বসে রুনা লায়লা, মহম্মদ রফি, হেমন্ত, মুকেশ শুনতে লাগলেন—টেপটা কী করে চালাতে হয় সেটাও শিখে নিলেন মহা উৎসাহে। গৌতমের কাকা ওটা এনে দিয়েছেন জাপান থেকে। নরহরিবাবু আমাদে বললেন সকালে ওঁদের বাড়ির সামনে ওঁর একটা ফোটো তুলে দিতে হবে, ওঁর স্ত্রীকে সুদ্ধু নিয়ে। তাঁর কোনো ফোটোই নেই। গান হচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে, আমরা গল্প করছি,

(শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায়)

লক্ষ্যভেদ ঃ

তীরন্দাজ স্মিতা দত্তরায়

—ডঃ মলয় পাহাড়ী

-রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ কিংবা কোন গোয়েন্দা কাহিনী কোনদিনই মন দিয়ে পড়িনি।" কথাগুলি বলে মৃদু হাসলো স্মিতা। স্মিতা দত্ত রায়। সপ্তদশী। জন্ম ১৯৬২ সালের ২রা অক্টোবর। নেতাজী নগর কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। কোলকাতার মেয়ে। বর্তমান নিবাস টালিগঞ্জের নেতাজীনগর।

"—ডিটেকটিভদের হাতে সব সময় থাকে রিভলভার। আমি এমন কোন গোয়েন্দার নাম শুনি নি যিনি তীর ধনুক হাতে গোয়েন্দাগিরি করছেন।"

সত্যি, অবিশ্বাস্য অভিযোগ এনেছে স্মিতা। মাত্র সতের বছর বয়সে একাধিক তীরন্দাজী বা ARCHERY প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে, বহু পুরস্কারও পেয়েছে। ১৯৮০তে এশিয়ান তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় ভারতের চারজন প্রতিযোগীর একজন ছিলেন স্মিতা দত্ত রায়। এই বছরই বাঙ্গালোরে সারা ভারত তীরন্দাজী জাতীয় প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন। ৫০ মিটারে প্রথম, ৭০ মিটারে দ্বিতীয় এবং ৬০ মিটারে তৃতীয়। তীরন্দাজী প্রতিযোগিতার কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক্।

স্মিতার বক্তব্য তুলে ধরলাম। একটি বিশেষ ধনুক এবং মোট ছয়টি তীর ছাড়া কোন তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া যায় না। যে ধনুক ব্যবহার করা হয় সেটি আমাদের দেশে সহজে পাওয়া যায় না। তীরগুলি অ্যালুমিনিয়ম আলয় ধাতুর তৈরী। তীরের পেছনে পাখীর পালকের পরিবর্তে থাকে প্লাস্টিক ভেনস্ ফেদার।

তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় নিশানা থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগীরা তীর ছোঁড়ে। ৫০ মিটার প্রতিযোগিতার অর্থ প্রতিযোগী নিশানা থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়বে।

একটু ছটফট্ করে স্মিতা আসল কথাটাই বলে ফেললো দুম করে।

—"রহস্যভেদ করতে চাই না, করতে চাই লক্ষ্যভেদ।"

—"এত খেলা থাকতে, তীর ধনুক নিয়ে মেতে উঠলে কেন ?"

প্রশ্নটা আচমকা। স্মিতা একটু থতমত খেয়ে আমার দিকে তাকালো। বললাম,

মেয়েরা তীর ছুঁড়ছে। এতো সচরাচর চোখে পড়ে না।"

স্মিতা বলল।

"—ছোটবেলায় মণিমেলার সদস্যা হিসেবে ভলিবল খেলতাম। সেই সময় ওখানে প্রথম তীরন্দাজী শেখানোর ব্যবস্থা চালু হয়। তখন তীরন্দাজী শিখতে শুরু করি।"

তীরন্দাজ রথীন দত্তের কাছে হাতেখড়ি। রথীনদত্ত আজও স্মিতার গুরু। এমনও হয়েছে গুরু ও শিষ্যা এক সঙ্গেই কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা আসে মাত্র কয়েক বছর আগে। ১৯৭৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে স্মিতা পেলো দ্বিতীয় পুরস্কার। ১৯৭৯ সালে সারা ভারত গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় তীরন্দাজী দুটি বিভাগে (৫০ ও ৩০ মিটারে) প্রথম পুরস্কার এবং রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে (৫০ ও ৩০ মিটার) তৃতীয় পুরস্কার ও সারা ভারত জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে (৪০ ও ২০ মিটার) প্রথম পুরস্কার। ঝাঁসীর রাণীর প্রমীলা বাহিনীতে অবশ্যই মেয়ে তীরন্দাজ ছিলো। ইতিহাস তো তাই বলে। এছাড়া মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বীর এবং ধর্নুবিদ্যায় পারদর্শী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কিছুদিন নারীর পোশাক পরে আত্মগোপন করেছিলেন একরাজ্যে। সেই রাজ্যের রাজকুমারীর সখী সেজে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন রাজকুমারীকে আনন্দদান করলেও, নারীর পোশাক পরে তিনি ধর্নুবিদ্যাটা ভুলে যাননি।

এরকম কোন পুরাণ বা মহাকাব্যের উপাখ্যান স্মিতাকে তীরন্দাজ খেলায় আকৃষ্ট করেছে কিনা জানতে চাইলে স্মিতা জানালো।

"—ছোটবেলায় বহু নৃত্যনাট্য অংশগ্রহণ করেছি। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে দেখেছি "কুরূপা" তীর ছুঁড়ছে। মেয়েদের তীর ছোঁড়া এবং এই খেলার প্রতি আকর্ষণ সেই থেকেই।"

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা ছোট্ট পড়ুয়ারা জেনে নাও। স্মিতা গোয়েন্দা বই পড়ে না। কিন্তু খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রচুর বই গোগ্রাসে পড়ে ফেলে। ভালো গান গায়, নাচে। এবং বড় হয়ে ইচ্ছে আছে ডাক্তার হওয়ার। সাহিত্যের প্রতিও রয়েছে বিশেষ অনুরাগ। কোন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে নাম করতে চাইলে অন্য দিকগুলো বাদ দিলে চলবে না। জীবনের প্রত্যেকটি দিককে উন্মেষিত করতে হবে।

স্মিতার মতে, আমাদের দেশে ARCHERY বা তীরন্দাজী খেলার জন্য চাই আরও সুযোগ-সুবিধা। যেমন ভালো ও উন্নতমানের তীর, ধনুক ও স্টেবিলাইজার। স্মিতা এখনও বিদেশে যায়নি। কিন্তু খোঁজ খবর রাখে প্রচুর। চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় মেয়েরা তীরন্দাজীতে অনেক এগিয়ে গেছে। তীরন্দাজী অলিম্পিক গেমের অন্তর্ভুক্ত। আগামীদিনে হয়তো ওলিম্পিকের আঙিনায় আমরা ভারতীয় তীরন্দাজদের দেখতে পাবো। সে ক্ষেত্রে ভারত কি পিছিয়ে থাকবে? স্মিতার জীবনের মূলমন্ত্র স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে স্মিতা তাই সংগ্রাম করছে। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় অপরের তীর ধনুক ব্যবহার করে সে পুরস্কার পেয়েছিলো। আজও স্মিতার নিজের ভালো তীর ধনুক নেই। কারণ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য যে তীর ধনুক দরকার তার মূল্য প্রায় দেড়হাজার টাকা।

স্মিতার বাবা শৈলেন দত্ত রায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার অফিসার। আকাশবাণীর গীতিকার ও সুরকার। শৈলেন দত্ত রায়ের সুরে গান গেয়েছেন আরতি বসু, সনৎ সিংহের মতো শিল্পীরা। রেকর্ড রয়েছে। গ্রামোফোনের ডিস্কে আজও তার সুরারোপিত গান, "ও আমার পারুল বকুল, আমার চম্পা ভাই" কিংবা "টাকডুম, টাকডুম বাজে" জনপ্রিয়। শ্রীদত্তরায় নিজে কোনদিন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেননি। তবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মেয়েকে। মা ও বাবার প্রেরণাই স্মিতার একমাত্র মূলধন। তাই যে কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলে স্মিতার মনে প্রথম যে মুখটি ভেসে ওঠে সেটি হলো তার স্নেহময়ী মায়ের। বড় বেশী মনে পড়ে মায়ের কথা।

যে মেয়ে নিখুঁত নিশানায় লক্ষ্যভেদ করে, যার আঙুলের ফাঁকে ধনুকের ছিলা এবং তীর সহজেই বশ মানে—সেই মেয়ে নিপুণ হাতে হারমোনিয়মের রীডে সুরের ঝংকার তোলে। নৃত্যের তালে তালে রূপ দেয় 'শ্যামা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে। বড় গোয়েন্দা হওয়ার শখ নেই জীবনে। শখ শুধু তীরন্দাজ হওয়ার, অব্যর্থ নিশানা। আগামী দিনের জন্য প্রাণবন্ত একটি প্রতিভা গোপনেই বেড়ে উঠছে টালিগঞ্জের নিভৃত কোণায়।

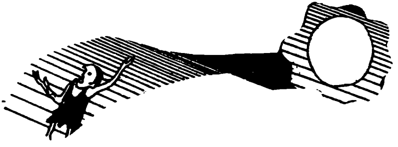

[ছোটদের বিজ্ঞানমনস্ক মজার গল্প]

কে-১০০

নিরঞ্জন সিংহ

খুব ভোরে ছোটকার ডাকে আমার আর সুদীপ্তর ঘুম ভেঙে গেল। গতকাল বিকেলে নেতারহাটে পৌঁছে পালামৌ ডাকবাংলোয় উঠেছি আমরা। আমরা মানে আমি, সুদীপ্ত আর ছোটকা। সুদীপ্ত আমার বন্ধু ও ক্লাসফ্রেণ্ড। আমরা দুজনেই ক্লাস সিক্সে পড়ি। গরমের ছুটিতে ছোটকা যখন আমাদের নিয়ে নেতারহাটে বেড়াতে যাওয়ার কথা তুলল তখন মা বাধা দেওয়ার বদলে বরং উৎসাহই দিলেন। ছোটকার হাতে একটা পুরোনো ইনল্যাণ্ড লেটার দিয়ে ফিসফিস করে কীসব যেন বুঝিয়ে বললেন ছোটকাকে। ছোটকাও দেখলাম বেশ হাসিহাসি মুখে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।' ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ রহস্যময় বলেই মনে হল। কারণ ছোটকা ডন বৈঠক করে বলে মা ওকে ডানপিটে বলেন। ছোটকাও মাকে বরাবর একটু যেন এড়িয়ে চলে। যাইহোক তখন বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে আমি মশগুল; সুতরাং ওসব ব্যাপার নিয়ে একটুও মাথা ঘামাই নি।

আমি আর সুদীপ্ত উঠে ভাল করে গরম জামা কাপড় পরে বাংলোর বাইরের লনে এসে দাঁড়ালাম। গরমকাল হলে কি হবে এখানে ভোরবেলা বেশ ঠাণ্ডা। লনে প্রচুর লোকের ভিড়। এখান থেকেই সবাই সূর্যোদয় দেখে। পাতলা অন্ধকার। কাউকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। লনের শেষ প্রান্ত হাত দুয়েক উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। পাচিলের নিচে বিরাট গভীর খাদ। নিচে ঝাউ পাইনের জঙ্গল। আমি আর সুদীপ্ত ডানদিকের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পাচিলটা একটু ফাঁকা দেখে দুজনে বসে পড়লাম সুদীপ্তকে বললাম, 'সাবধানে বসবি, একদম সামনের দিকে ঝুঁকবি না। পড়ে গেলে কিন্তু সর্বনাশ।' সুদীপ্ত কিন্তু আমার সাবধান বাণী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। ছোটকাকে দেখতে পেলাম না। ভিড়ের মধ্যে কোথাও জায়গা করে নিয়েছে।

একটু একটু করে ফর্সা হতে শুরু করল। দূরের আকাশ সামান্য একটু লাল হয়ে উঠল। আমি অধীর আগ্রহে সামনের আকাশের দিকে তাকালাম। কখন সূর্য উঠবে? কেমন করে উঠবে? নেতারহাটের সূর্যোদয় সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য। আমার সারা মন জুড়ে তখন সূর্যোদয়ের চিন্তা। হঠাৎ মনে হল আমার পাশ থেকে কিছু যেন সামনের খাদে গিয়ে পড়ল। ভাবলাম মনের ভুল। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকিয়ে সুদীপ্তকে দেখতে না পেয়ে আমার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। কোথায় গেল সুদীপ্ত? তবে কি সুদীপ্তই নিচে পড়ে গেল? সূর্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। ছোটকাকে ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করে আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম, 'ছোটকা, সুদীপ্ত সামনের খাদে পড়ে গেছে।' ছোটকা চমকে উঠে বলল, 'কি বলছিস? ও তো তোর সঙ্গেই ছিল। নিচে পড়ল কি করে?' আমি সব বললাম। ছোটকা আর কোন কথা না বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ডানদিকের ঢালু রাস্তা বেয়ে নিচে নামতে

(শেষাংশ ৪১ পৃষ্ঠায়)

(৩৬ পৃষ্ঠার পরে)

হঠাৎ দরজার ধারে নিঃশব্দে দুটি মূর্তি এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতে ঝকঝক করছে ওগুলো কী? রামদা যে! ড্যাগার' যাকে বলে। এবং নরহরিবাবুর এক মুহূর্তেই চেহারা পালটে গেল। "ঘড়িগুলো খুলে দিন। পকেটে যা আছে এই বিছানার ওপরে জড়ো করুন। ক্যামেরাটাও নাবিয়ে রাখুন। ক্যাসেটগুলোও। হ্যাঁ, টেপরেকর্ডারটা আমার কাছেই থাকলো। সব কিছু বের করে দিন! শার্টগুলো খুলে ফেলুন—হ্যাঁ, এবার আমরা সব চেক করে দেখব কোথায় কী আছে।" ডানহাতে নরহরিবাবু একটি পিস্তল উঁচিয়ে আছেন। সেই দুটি ছেলে এবার ভেতরে এসে আমাদের হাতগুলো পটাপট বেঁধে ফেলল। স্তম্ভিত, হতভম্ব আমরা। সব কিছু খুঁজে পেতে বের করে নিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গা থেকে শার্ট প্যান্ট গুলি পর্যন্ত খুলে নিল তারা। পরনে কেবল রইল গেঞ্জি, ইজের। —ওরা আপনাদের এবার ডিঙিতে তুলে দেবে। ফের যদি এদিকে আসার চেষ্টা করেছেন, অথবা পুলিশ এনেছেন তাহলে কিন্তু রাজীববাবু আর সঞ্জীববাবুর আর রক্ষে নেই। একেবারে হাপিস করে দেব। ও কদম তলাটা আমাদের মুঠোর মধ্যে।"……এতরাত্রে ডিঙিতে করে অন্ধকারে? হাত বাঁধা কী করেই বা যাব'—পরনে গেঞ্জী ইজের। ……পালাব কোনদিকে? ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছি। টর্চ নেই কারুর সঙ্গে একটা। সিগারেট দেশালাই পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে ওরা।—কী ভাগ্যি খুন করেনি!—ক্যানালের দিকেই যাচ্ছি, না শ্মশানে মশানে যাচ্ছি, কে জানে। আঁধারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। ভীতু গৌতমটা তো ঘুনঘুন করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। এক ধাক্কা লাগালো তার পিঠে নরহরিদের চেলা। "—এ্যাই চোপ! মেয়ে মানুষের অধম! শহুরে বাবুগুলোর মুয়ে আগুন!" ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা মাত্র গেছি, এমন সময় কী যেন হয়ে গেল। হৈ হৈ রৈ রৈ মার্ মার্ কাট্‌কাট্ করে জনাপঞ্চাশেক মানুষ লাঠি—বাঁশ—দা—কাটারি—বঁটি কাস্তে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো, ঘিরে ফেললো মুহূর্তের মধ্যে আমাদের—কেড়ে নিল নরহরির পিস্তল, তার সঙ্গীদের অস্ত্র আর বেঁধে ফেলল তিনজনকে। আমাদের তো হাত পা বাঁধা ছিলই। হঠাৎ নরহরি চেঁচাতে শুরু করে দিল—"এরা ডাকাত। এরা ডাকাত। আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে—বাঁচাও বাঁচাও!" চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের চেঁচামেচিতে গণ্ডগোলে, মশালের আলোয় মুহূর্তেই আঁধার কেটে গেল। ডাকাত আর কে ডাকাত নয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীরা আমাদের হাত খুলে না দিয়ে সবাইকে শুদ্ধ নিয়ে একটা ঘরে পুরে দিয়ে বলল—"ক্যাকা? ও ডাকাত? সে ডাকাত? আমরা জানিনা? তোরা সব ব্যাটাই ডাকাত! আজ ধরেছি।" রাজু-সঞ্জু চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, আমরা নই, আমরা ডাকাত নই! আমরা কলকাতার ছাত্র। ওই ঘরে গিয়ে দেখুন আমাদের পরনের পোশাক পর্যন্ত পড়ে আছে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বিছানার ওপর জড়ো করে রেখেছে। আমাদের এইভাবেই ডিঙিতে তুলে দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ল্যাংটো করে।" আমাদের অবস্থা এক নজর দেখে নিয়ে একজন চাষী ভেংচে উঠল—"ডিঙিতে তুলে দিত না আরো কিছু। কেটে লাশ ভাসিয়ে দিতো খালে—শালা বোকা শহরের বাবুগুলো"—তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। খালের ধারে নিয়ে গিয়ে আমাদের মেরেই ফেলতো ওরা। গাঁয়ের ভেতর মারলে মুশকিল।

দেখলুম গাঁয়ের লোকেরা নরহরি দাসের ওপর ভীষণ খাপ্পা। শক্ত দড়ি দিয়ে তাদের বেঁধে রেখেছে একটা বাঁশের খোঁটার সঙ্গে। প্রত্যেককে ঘিরে আছে কুড়ি বাইশ জন লোক। শুনলুম নরহরি দাসের বৌকেও বন্ধ করে রেখেছে ওরা একটা ঘরে। আমাদের জামাকাপড়গুলো এনে পরতে দিল বটে, কিন্তু পুলিস না এলে কাউকে ছাড়বেনা বলল। ওদের দৃঢ় ধারণা, ডাকাত না হলেও আমরা নির্ঘাৎ স্মাগলার। যত বোঝাই যে আমরা এখানকার লোক নই, কলকাতার ছাত্র, কেউ বুঝবেনা। শুনলুম কিছুদিন ধরে ওদের গ্রামে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে। বাংলাদেশ-বর্ডার পেরিয়ে ডাকাতরা আসে। গরু ছাগল নিয়ে যায়। আর এই নরহরিদাসের বাড়িতে কেবলই অচেনা সব লোকের আনাগোনা। তারা আসে এবং রাত কাটায়; কীসব জল্পনাকল্পনা হয়। বাংলাদেশ-বর্ডারের সঙ্গে ওদের স্মাগলিঙের ব্যবসা আছে বলে গ্রামবাসীদের সন্দেহ। কিন্তু প্রমাণ নেই হাতে। আজ

(শেষাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

শুরু করল আকাশ ফর্সা হলেও নিচের দিকে তখনো বেশ আবছা অন্ধকার। আমার সারা মন জুড়ে তখন সুদীপ্তর চিন্তা। নামতে নামতে ছোটকা কয়েকবার সুদীপ্তর নাম ধরে ডাকল; কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নিচে নামতেই আমরা এসে পড়লাম ঝাউ পাইনের জঙ্গলের মধ্যে। ঘন জঙ্গল। সামনেটা ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। ততক্ষণে সূর্য উঠে গিয়েছিল বলেই মনে হল আমার। মাথার উপরটা গাছের ডালপালায় প্রায় ঢাকা। আমার গা ছমছম করতে লাগল। আমি ছোটকার হাত জোরে চেপে ধরলাম। গাছের ডালেডালে নানা ধরনের পাখি কিচমিচ করে ডাকছে। আমরা কোনরকমে এগিয়ে গিয়ে ঠিক পাচিলটার নিচে ভালো করে খুঁজলাম। ছোটকা আবার সুদীপ্তর নাম ধরে ডাকল। কিন্তু সুদীপ্তর কোন খোঁজই পেলাম না। আশ্চর্য ব্যাপার! গেল কোথায় ও। ওপর থেকে পড়লে ওকে এখানেই খুজে পাওয়া উচিত। সুদীপ্তকে ছাড়া কি করে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব? ওর মাবাবাকে কি বলব? আমার দুচোখ জলে ভরে উঠল। ছোটকা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, 'কাদিস নে, সুদীপ্তকে আমরা ঠিক খুঁজে বের করব।' ছোটকা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপরের দিকে তাকিয়ে গাছের ডালপালাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর সুদীপ্তর নাম ধরে আরো কয়েকবার ডাক দিল। কিন্তু কোন লাভ হল না। ছোটকা এবার বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে এগুতে শুরু করল। আমি একটু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছোটকা আর জঙ্গলের ভিতর ঢুকো না।'

ছোটকা আমার কথার জবাব না দিয়ে কিছু একটা যেন লক্ষ্য করে এগুতে লাগল। মনে হল ছোটকা যেন কিছু দেখতে পেয়েছে। আমিও ছোটকাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। খানিকটা সামনের দিকে এগুতেই হঠাৎ জঙ্গলটা বেশ ফাঁকা হয়ে এল। সামনে একটা পুরোনো একতলা বাড়ি দেখতে পেয়ে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। বাড়িটা বেশ পুরোনো, বাইরের ইটগুলোয় নোনা ধরে গেছে। পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হল। ছোটকা একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর বাড়িটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে আপনমনেই বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে কোয়েল নদীর দিক থেকে বাড়িতে যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে।' কথা শেষ করে ছোটকা খুব দ্রুত বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। আমিও ওর পিছু নিলাম। ছোটকার কথাই ঠিক। নিচের দিক থেকে একটা সরু পায়ে চলার রাস্তা এগিয়ে এসেছে বাড়িটার সদর দরজা পর্যন্ত মনে হচ্ছে রাস্তাটা দিয়ে লোক চলাচল করে। তার মানে এই পোড়ো বাড়িটায় লোক থাকে? আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসার মত হল কৌতূহলে। ছোটকা এগিয়ে গিয়ে সদর দরজায় ঘা দিল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমি ভয়ে ভয়ে ছোটকার পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পরও ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। মনে হল বাড়িতে কেউ থাকে না। ছোটকার মনেও এতোক্ষণে বোধহয় সন্দেহ দেখা দিল। ছোটকা ভাবতে লাগল এবার কি করা যায়। ঠিক এমন সময় সদর দরজাটা আস্তেআস্তে খুলে গেল। দরজার ফাঁকে দেখা গেল একজন প্রৌঢ় মানুষের চেহারা। রোগা, লম্বা, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরনে একটি পায়জামা আর গায়ে পশমের শাল। মাথার চুল কাঁচাপাকা। ছোটকার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীরস্বরে বলে উঠলেন, 'কে তোমরা? এই সাতসকালে জ্বালাতে এসেছো?'

ছোটকা বলল, 'আমরা নেতারহাটে বেড়াতে এসেছি।'

'বেশ করেছো। অনেকেই নেতারহাটে বেড়াতে আসে; কিন্তু কেউ অসভ্যের মত ভোরবেলা লোককে বিরক্ত করে না তোমাদের মত।' বলেই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন। ছোটকা বোধহয় আগে থাকতেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। তাই ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আগেই আমার হাত ধরে ভদ্রলোককে ঠেলে দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর একটু হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে একগ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?'

আমাদের এইভাবে জোর করে ঘরে ঢুকে পড়া যে ভদ্রলোক মোটেও পছন্দ করেন নি তা ওঁর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'তোমরা শুধু অসভ্য নও, অভদ্রও।' তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন।

ছোটকা তাড়াতাড়ি ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে নিল। আমায় বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। এইরকম গভীর জঙ্গলের মধ্যে, একটা পোড়ো বাড়িতে যে কেউ বাস করতে পারে একথা বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক একগ্লাস জল এনে ছোটকার হাতে দিলেন। ছোটকা জলের গ্লাসটা ভদ্রলোকের হাত থেকে নিয়ে সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। ভদ্রলোক সব লক্ষ্য করে ভ্রূ কুঁচকে ছোটকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হল? জল খেলে না?'

'খাব, একটু জিরিয়ে নিই। তার আগে একটা কথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি? প্রশ্নটা অবশ্যই অভদ্র।'

ভদ্রলোক এবার বেশ রেগে গেলেন কোন কথা বললেন না।

ছোটকা কিন্তু একটুও না দমে বলল, 'আমি জানতে চাই এই নির্জন জঙ্গলের একটা ভাঙা পোড়ো বাড়িতে বাস করছেন কেন?'

'সে জবাবদিহি কি তোমার কাছে করতে হবে?' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক।

'জবাবদিহি করা না করা আপনার ইচ্ছে।' শান্তভাবে বলল ছোটকা।

'ছ্যাখো ডেঁপো ছোকরা তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট করার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই। জল খেয়ে এখান থেকে বেরোও। আর তা যদি না যাও তাহলে পুলিসকে জানাতে আমি বাধ্য হব

'পুলিসকে আমরাই খবর দেব।' বলল ছোটকা। আমি ছোটকার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'তার মানে?'

'মানে খুবই সোজা। কিছুক্ষণ আগে পালামৌ বাংলোর সামনে থেকে একটি ছেলে সামনের খাদে পড়ে গেছে। আমরা ছুটে এসেছি নিচে সঙ্গে সঙ্গে। এখানে এসে আমরা ছেলেটাকে খুঁজে পেলাম না। খুঁজে পেলাম এই পোড়ো বাড়ি আর আপনাকে।'

'হ্যাঁ; তাতে কি দাঁড়ালো।' ভদ্রলোক এবার যেন একটু নরম সুরে কথা বললেন।

'দাঁড়ালো এই যে আহত ছেলেটিকে আপনিই তুলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছেন।'

ছোটকার কথা শুনে ভদ্রলোকের চোখমুখের যা অবস্থা হল তাতে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'বলো কি হে ছোকরা। একটা ছেলে পালামৌ বাংলোর সামনে থেকে নিচে পড়ে গেল—খুঁজে পেলে না বলে ধরে নিলে আমি তাকে তুলে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছি?'

'আমার তাই বিশ্বাস।' বলল ছোটকা। আমার কিন্তু মনে হল ছোটকা একটু গোঁয়ারের মত কথা বলছে। ভদ্রলোক কেন শুধু শুধু সুদীপ্তকে লুকিয়ে রাখতে যাবেন? আমি ছোটকাকে সেকথা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ছেলেটি যে সত্যি সত্যি নিচে পড়ে গেছে তা বুঝলে কি করে? পড়ে যেতে দেখেছো?'

আমি এবার ভদ্রলোকের কথার জবাব দিলাম। আমার কথা মন দিয়ে শুনে উনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার বিশ্বাস তোমার বন্ধু নিচে পড়ে নি। তুমি ওকে নিচে পড়তে নিজে চোখে দেখোনি বা কোন চিৎকারও শোন নি।' আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম। তাই যেন হয়। সুদীপ্ত যেন উপরেই কোথাও থাকে। আমি তাড়াতাড়ি ছোটকাকে বললাম, 'ছোটকা চলো আমরা তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে সুদীপ্তকে খুঁজে দেখিগে।'

ছোটকার উপর আমার বেশ রাগ হল। এখন বুঝতে পারলাম মা কেন ওকে গোঁয়ার আর ডানপিটে বলেন।

ভদ্রলোক ছোটকার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ তোমার যখন সন্দেহ জেগেছে তখন আমার বাড়ি ভাল করে খুঁজে দেখ; কিন্তু একটা শর্তে।' বলে একটু থেমে ছোটকার মুখের অবস্থাটা ভালভাবে লক্ষ্য করে বললেন, 'কি রাজী?' 'কি শর্ত?' প্রশ্ন করলাম আমি। ভদ্রলোককে উত্তর দিতে না দিয়ে ছোটকা বলে উঠল, 'আপনার ঘরগুলো আগে আমাদের দেখান।'

'এসো, আমার সঙ্গে'; বলে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে চললেন বাড়ির ভিতরে। একে একে সব ঘরগুলো আমরা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। কিন্তু কোথাও সুদীপ্তর

সন্ধান পেলাম না। ভদ্রলোক এবার একটু হেসে ছোটকার মুখের দিকে তাকালেন। ছোটকা কিন্তু বেপরোয়া। ও বলল, 'মনে হচ্ছে ডানদিকের কোণের ওই ঘরটি আপনি আমাদের দেখান নি।'

ভদ্রলোক এবার দরাজগলায় হেসে উঠলেন, 'যতখানি বোকা তোমাকে ভেবেছিলাম, দেখছি ততখানি বোকা তুমি নও। ঠিকই ধরেছো। ওই ঘরখানা আমি ইচ্ছে করেই তোমাদের দেখাইনি। এসো আমার সঙ্গে। তবে একটা কথা এই ঘরখানা দেখা হয়ে গেল গোটা বাড়িটা দেখা হয়ে যাবে। এ ঘরেও যদি হারানো ছেলেটিকে না পাও তাহলে আমার শর্ত পালন করতে হবে। তখন পিছিয়ে গেলে কিন্তু আমি ছাড়ব না। আমিই তখন উলটে পুলিসের হাতে তুলে দেব, আমার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্যে। মনে থাকে যেন ভদ্রলোকের এক কথা', বলতে বলতে ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে নিয়ে ডানদিকের কোণার ঘরটিতে ঢুকলেন। ঘরটা খুব বড় নয়; কিন্তু সারা ঘর ভর্তি অসংখ্য কাচের জারে নানা রঙের ওষুধ তাকে সাজানো। আর অদ্ভুত ধরনের প্রচুর সব যন্ত্রপাতি বসানো রয়েছে টেবিলের উপরে। এক নজরেই বোঝা যায় একটি ছোটোখাটো বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার।

'ঘরটি আমার গবেষণাগার। এ ঘরটাও ভাল করে খুঁজে দেখ।' বলে ভদ্রলোক একটা উঁচু টুলের উপর বসে পড়লেন।

ছোটকাও হতাশ হয়ে একটা টুলের উপর বসে পড়ল। ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন। 'তাহলে হারানো ছেলেটিকে আমার বাড়িতে খুঁজে পেলে না? এবার আমার শর্তমত কাজ করতে রাজী তো? অবশ্য রাজী না হলে পুলিস ডাকতে বাধ্য হব সে কথা আগেই জানিয়েছি।'

আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কি আপনার শর্ত?'

'বোসো, বোসো তবে তো কথা হবে,' বলে আর একখানা খালি টুল আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি কোন কথা না বলে টুলটাতে বসে পড়লাম।

'জানতে চাইছিলে না—এই নির্জন জঙ্গলের পোড়ো বাড়িতে আমি কি করছি। শোনো তাহলে। এই নির্জন গবেষণাগারে বসে আমি এক যুগান্তকারী গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। সব কথা তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না। তবে যাতে বুঝতে পার, সেইভাবে বলছি। আমি এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছি যার সাহায্যে দেশের প্রত্যেকটা মানুষকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বহু জিনিস শেখানো সম্ভব হবে। দেশে আর একটি মূর্খ মানুষ থাকবে না। পাঠশালা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও আর দরকার হবে না। ওষুধটার নাম দিয়েছি কালিদাস ১০০ বা সংক্ষেপে কে-১০০। মূর্খ কালিদাস যেমন মা সরস্বতীর বরে বিখ্যাত কবি হয়েছিলেন, আমার এই কে-১০০ ইনজেকসান নিলে একজন মূর্খ কালিদাসের থেকেও ঢের বেশী জ্ঞানী হয়ে উঠবে। ওষুধটা হচ্ছে একধরনের ব্রেন প্রোটিন। এই ওষুধের সাহায্যে একটা ছ'বছরের ছেলে খুব অল্প সময়ে গ্রাজুয়েট ক্লাসে যা পড়ানো হয় তা খুব ভালভাবে শিখে ফেলতে পারবে। আজকে পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যায় কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে রোজ কত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই প্রকাশিত হচ্ছে। একটা মানুষ সারাজীবন ধরে পড়াশুনা করলেও সব বিষয় ভালভাবে জানতে পারে না। কিন্তু আমার কে-১০০ এই সমস্যার খুব সহজ সমাধান করে দেবে। একটা ইনজেকসান নিলেই ব্যস্—সে হয়ে যাবে পৃথিবীর মধ্যে সব বিষয়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। বলো ওষুধটা ভাল না?'

ছোটকা বলল, 'হ্যাঁ খুবই ভাল ওষুধ, বাজারে ছাড়লে রাতারাতি আপনিও কোটিপতি হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনার এই আষাঢ়ে গল্পের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?'

'বলছি। ওষুধটা আবিষ্কার করার পর প্রথমে ইঁদুরের উপর, তারপর গিনিপিগ আর সবশেষে বাঁদরের উপর পরীক্ষা চালালাম। ফল পেলাম চমৎকার। সব শেষে মানুষের উপর পরীক্ষা না করলে তো ওষুধের ফলাফল বুঝতে পারব না। তা হঠাৎ মানুষ আর কোথায় পাই। আমার ছোকরা চাকর শমরুকে অনেক কষ্টে ইনজেকসান নিতে রাজী করালাম। অদ্ভুত ফল পেলাম। ব্যাটা শক্ত শক্ত ইকনমিকসের সমস্যার উত্তর খুব সহজেই দিতে লাগল। আইনস্টাইনের জগদ্বিখ্যাত সূত্র 'থিওরী অব রিলেটিভিটি'

বা আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ওকে প্রশ্ন করতেই ও এমন সব জবাব দিতে লাগল যে আমি তার মানেই বুঝতে পারলাম না। ব্যাটা সেদিনই আমাকে একা ফেলে পালিয়ে গেছে। অনেক খোঁজখবর করেও তার সন্ধান পাইনি। তাই ওষুধের ফলাফলটা পুরো জানতে পারিনি। তবে সত্যি কথা বলতে কি শমরুর পালানোয় আমি খুশিই হয়েছিলাম। বাড়িতে অত জ্ঞানী চাকর থাকা রীতিমত এক সমস্যার ব্যাপার। কখন কি প্রশ্ন করে বসবে তার কোন ঠিক আছে? তা যা হোক তোমরা এসে পড়ায় ভালই হল, আমি আরো দুজনের উপর আমার কে-১০০ পরীক্ষা করে দেখতে পারব।' বলে ভদ্রলোক একটা সিরিঞ্জে কী একটা ওষুধ ভরে নিলেন; হয়তো ওই কে-১০০। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আগে এই বাচ্চাটার উপর পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

কথাটা শুনেই ভয়ে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে ছোটকার দিকে তাকালাম। দেখলাম ছোটকা টুল ছেড়ে উঠে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এসে খুব নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিই কি ডঃ ঘোষ?'

ভদ্রলোক ছোটকার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার নাম জানলে কি করে?'

দেখলাম ছোটকা পকেট থেকে মায়ের দেওয়া সেই পুরোনো ইনল্যাণ্ড লেটারটা বের করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল। 'এই চিঠিটা কি আপনারই লেখা?'

চিঠিখানা ছোটকার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'এ চিঠি তোমার কাছে এল কি করে হে ছোকরা?'

'আপনিই তাহলে ডঃ প্রমথ ঘোষ? আমার আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল।' বিড়বিড় করে যেন আপনমনেই বলে উঠল ছোটকা।

'কিহে, চিঠিটা কোথায় পেয়েছো তাতো বললে না।'

ছোটকা ভদ্রলোকের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢিপ করে একটা প্রণাম সেরে আমাকেও ইশারায় প্রণাম করতে বলল। আমি কিছু না বুঝেই ছোটকার নির্দেশমত ভদ্রলোককে প্রণাম করলাম।

'ব্যাপার কি? হঠাৎ এত প্রণামের ঘটা!' ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে বলে উঠলেন।

'ব্যাপার আর কিছুই না। আমরা নেতারহাট আসছি শুনে বৌদি আপনার খোঁজ নিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে এভাবে পরিচয় হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

ছোটকার কথায় মনে পড়ল মার এক দূর সম্পর্কের কাকা নেতারহাটে থাকেন বলে শুনেছিলাম। তিনিই তাহলে ইনি।

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার চিবুকে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি—মানে তুই কি সুষমার ছেলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোর দাদু—' বলেই উনি এমন জোরে হেসে উঠলেন যে আমার ভয় হল নোনা ধরা পোড়ো বাড়িটা না হুড়মুড় করে মাথার উপর ভেঙে পড়ে। হাসি থামিয়ে বললেন, 'বুঝেছি, সুষমা চিঠি লিখে লিখে উত্তর না পেয়ে পেয়াদা পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ঠিক এমন সময় বাইরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল সুদীপ্ত আর পালামৌ বাংলোর কেয়ারটেকার। আমি ছুটে গিয়ে সুদীপ্তকে জড়িয়ে ধরলাম। সুদীপ্ত একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দাদু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। উনিই সুদীপ্তকে সব ব্যাখ্যা করে বললেন। সব শুনে সুদীপ্ত বলল, 'কি আশ্চর্য! ওখানে বসে ভালভাবে দেখা যাবে না বলে উঠে বাঁদিকে গিয়ে বসেছিলাম। সূর্যোদয়ের পর তোদের না দেখতে পেয়ে খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কাউকে দেখতে পেলাম না তখন কেয়ারটেকারকে সব বললাম। ও বলল অনেকক্ষণ আগে তোকে আর ছোটকাকে এই দিকে নেমে আসতে দেখেছিল বলে ও আমাকে এখানে নিয়ে এল।' সুদীপ্ত কথা শেষ করতেই দাদু বলে উঠলেন 'আর এরা এসে আমার উপর হামলা শুরু করে দিল।' বলে আবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

হঠাৎ দাদু হাসি থামিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমাদের চোখ চলে গেল দরজার দিকে। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে কাচুমাচু মুখ করে। দাদু বললেন, 'শমরু তুই ফিরে এসেছিস?'

'হ বাবু। এখন আমি ভাল আছি। যে দানোটা আমার

(শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

ছবি

প্রতাপচন্দ্র রায়

আমাদের স্কুলের হাফ্-ইয়ারলি পরীক্ষা শেষ হবার পরের দিন আমার খুড়তুতো ভাই পরেশ আমাকে বলল "হ্যাঁরে রমেশ, গ্রীষ্মের ছুটিটা কিভাবে কাটানো যায় একবার ভেবে দেখেছিস ?"

পরেশ আমার চাইতে মাত্র তিন মাসের ছোট। আমরা এক জায়গাতেই থাকি, একসঙ্গে খাই, খেলি, বেড়াতে যাই আর পড়ায় ফাঁকি দি। পাড়ার আর স্কুলের ছেলেরা আমাদের বলে 'মানিকজোড়'। আমি বললাম "গ্রীষ্মের ছুটিটা বোধহয় বইপত্র নিয়েই কাটাতে হবে। এবার আমার পরীক্ষা ভাল হয়নি।"

পরেশ বলল, আমারও ঐ একই দশা, কিন্তু দিনরাত কি লেখাপড়া নিয়ে থাকা যায়, তুইই বল। আমি বলছিলাম কি মাসখানেকের জন্যে দেশের বাড়িতে গেলে হয়না ? সেখানে পড়াও হবে, বেড়ানোও হবে।

আমি ভেবে দেখলাম পরেশ ঠিকই বলেছে। দেশের বাড়িতে আমরা কখনো যাই নি। বাবা আর কাকা আমাদের এই প্রস্তাব শুনে খুব খুশী হয়ে পড়লেন। বললেন "আমাদের পদ্মপুকুর গ্রামের বাড়িটা মেরামতের অভাবে অনেক ভেঙ্গে চুরে গেছে, তবুও তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে বাড়িটা এক সময় কত বড় ছিল। ওখানে তোমাদের রাঙা পিসিমা আছেন। তাঁর কাছে তোমরা পুরোনো দিনের অনেক কথা শুনতে পাবে।"

পরের রোববার আমরা কাকার সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে এলাম। আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে কাকা বললেন, "আমাদের গ্রামে কোন স্টেশন নেই। তোমরা রতনপুরে নামবে। সেখান থেকে পদ্মপুকুর মাইলখানেকের রাস্তা। তোদের রাঙাপিসিমাকে খবর দেওয়া হয়েছে। হয়তো তিনি স্টেশনে লোক পাঠাবেন।"

রতনপুর স্টেশনে নেমে দেখলাম প্ল্যাটফর্মে আমরা ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। স্টেশন মাস্টারের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম একজন আধাবয়েসী লোক মাথা নীচু করে কি যেন লিখছেন। তাঁকে পদ্মপুকুরের রাস্তা জিজ্ঞেস করতেই তিনি হেসে বললেন "ওহো, বুঝতে পেরেছি। তোমরা চৌধুরীনিবাসে যাচ্ছ। তোমাদের পিসিমা আমাদের বিশেষ করে বলে দিয়েছেন তোমাদের সঙ্গে একজন লোক দেবার জন্যে। দাঁড়াও, দেখছি।" বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচ সাত পরে স্টেশনের একজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন—'তোমরা এর সঙ্গে চলে যাও। কোন অসুবিধে হবে না। এর নাম বুধন।'

আমরা বুধনের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে পদ্মপুকুর গ্রামে পৌঁছলাম। আমরা এর আগে কখনও গ্রাম দেখিনি। ট্রেনে যেতে যেতে অনেক গ্রাম চোখে পড়েছে, কিন্তু নেমে দেখবার সুযোগ হয়নি। নারকেল গাছ আর আমবাগানে ঘেরা ছবির মত এই গ্রামটিকে দেখে আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠল। বাড়িতে পৌঁছে দেখি রাঙাপিসিমা দাওয়ায় বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে যা আদর যত্ন পেলাম তা মামার বাড়িতেও পাওয়া যায় না।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা রাঙা পিসিমার কাছে শুলাম। অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প করা গেল। রাঙাপিসিমা বললেন "এ বাড়ির সবই ভেঙ্গে গেছে, শুধু এই চারটে ঘরই

যা আস্ত রয়েছে। অথচ একসময় এইটেই ছিল এই গ্রামের জমিদার বাড়ি। কাল সকালে দেখবি ঠাকুরঘরে একটা বড় ছবি টাঙানো আছে। ওটা আমার ঠাকুরদাদা, মানে তোদের প্রপিতামহ বটুকেশ্বর চৌধুরীর ছবি। আমি তাঁকে দেখিনি তবে বাবার মুখে তাঁর কথা অনেক শুনেছি। উনি খুব বিদ্বান লোক তো ছিলেনই, তাছাড়া ওঁর দৈবশক্তি ছিল। লোকে গুরুঠাকুর বলে ডাকতো। যাকে যা আশীর্বাদ করতেন তা ফলে যেত। এখনও গ্রামের ছেলেরা পরীক্ষা দিতে যাবার সময় ওঁর ছবিকে প্রণাম করে যায়।" গল্প শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা মুখ হাত ধুয়েই আমাদের প্রথম কাজ হল গুরু ঠাকুরের ছবি দেখতে যাওয়া। ঠাকুরঘরের দেয়ালে টাঙানো বিরাট অয়েল পেন্টিংটা দেখে মনে হল গুরুঠাকুর শুধু সুন্দরই ছিলেন না, বেশ বলবানও ছিলেন। ছবিটা বহুদিনের পুরোনো হলেও দেখলে মনের মধ্যে কেমন শ্রদ্ধা জাগে। গড় হয়ে দু'জনে প্রণাম করলাম আমাদের পূর্ব পুরুষকে। মনে মনে বললাম "গুরু ঠাকুর; তুমি গ্রামশুদ্ধ ছেলেকে আশীর্বাদ করো, আর আমাদের করবে না? হাফ্ ইয়ারলি পরীক্ষায় যা রেজাল্ট হবে তাতো জানাই আছে, ফাইন্যালে যেন কাঁদতে না হয়।"

তারপরে আমরা পদ্মপুকুরে যে ক'টা দিন ছিলাম গুরুঠাকুরকে প্রণাম না করে জল খেতাম না।

আমাদের ছুটি ফুরিয়ে এল। কলকাতায় ফিরবার দিন সকালবেলা ঠাকুর ঘর ঝাঁট দিতে দিতে পিসিমা আমাদের বললেন "আজ দশহরা। পূজো করবার জন্যে পুরোহিত মশায়কে আসতে বলেছি; কিন্তু তিনি তো এখনও এলেন না। আমি যাচ্ছি তাঁর বাড়িতে; তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে ঘন্টা খানেক তো লাগবেই। তবে ইতিমধ্যে তিনি যদি এসে পড়েন তাহলে তোরা ঠাকুরঘরে কম্বলের আসন পেতে তাঁকে বসাবি।"

পিসিমা চলে যাবার পর আমরা ঠাকুরঘরের বড় সিন্দুকটার ওপর বসে গল্প করতে লাগলাম। পরেশ বলল "গুরু ঠাকুরের ছবিটা কেমন জল জল করছে, দেখেছিস?" তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তো। বললাম "ভোরবেলা আমরা যখন প্রণাম করতে এসেছিলাম তখন ছবিটা এত উজ্জ্বল ছিলনা। তাহলে বোধহয় রাঙাপিসিমা ছবিটাকে তেলজল দিয়ে মুছে পরিষ্কার করেছেন।" পরেশ বলল 'তা হতে পারে। কিন্তু খুব বেশী রকম উজ্জ্বল মনে হচ্ছে, ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন।' মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। গড় হয়ে প্রণাম করলাম গুরুঠাকুরকে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা ছায়া পড়তেই আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নামাবলী গায়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বুঝলাম উনিই হচ্ছেন পুরোহিত মশায়। কম্বলের আসনটা পেতে দিয়ে বললাম "আপনি বসুন, পিসিমা বোধহয় আপনাকে খুঁজতে গেছেন।"

আসনে বসে পুরোহিত মশায় বললেন "তোমরা দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসেছ বুঝি?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

এইবার আমাদের মনে পড়ল পুরোহিত মশায়কে প্রণাম করা হয়নি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই পুরোহিত মশায় বললেন "তোমরা ওখান থেকেই উদ্দেশে প্রণাম কর। আমাকে ছুঁয়োনা।" আমরা মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।

পুরোহিত মশাই হেসে বললেন—'প্রণাম যখন করলে তখন আমার উচিত হচ্ছে তোমাদের আশীর্বাদ করা। কি আশীর্বাদ করি বলোতো?' আমরা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম আমরা ফাইন্যাল পরীক্ষায় যেন ভাল রেজাল্ট করতে পারি। আমাদের হাফ্ ইয়ারলি পরীক্ষা এবার খুব খারাপ হয়েছে।

'ঠিক আছে' পুরোহিত মশাই হেসে বললেন, 'তাই হবে।' এতক্ষণে আমাদের নজর পড়ল পণ্ডিত মশায়ের চেহারার দিকে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। চোখদুটো টানাটানা আর অতি মাত্রায় উজ্জ্বল। চোখে চোখ রেখে কথা বলা যায় না। একটু চুপ করে থেকে পুরোহিত মশায় বললেন, 'তোমরা বোধ হয় মন দিয়ে পড় না। কেমন ঠিক বলিনি?'

পরেশ মাথা নীচু করে বলল "আজ্ঞে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারি না।"

'কি কি বিষয় পড় তোমরা?'

ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক আর বিজ্ঞান।

'ইতিহাস পড়তে তোমাদের কেমন লাগে?'

পরেশ বলল, ইতিহাস পড়তে আমাদের মোটে ভাল লাগে

না। ঐ জন্যেই তো কম নম্বর পাই।

ধব ধবে সাদা পৈতেটা হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে পণ্ডিত মশায় বললেন—'তোমাদের গুরুঠাকুর মারা গেছেন ঠিক একশো বছর আগে। তখনকার লোকেদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে না?'

আমরা বললাম, 'খুব ইচ্ছে করে।'

তাহলে শোন—তখনকার দিনে এত গাড়িঘোড়ার প্রচলন ছিল না, এ অঞ্চলে তো নয়ই। যানবাহন বলতে যা ছিল তা গরুর গাড়ি আর পালকি। যদি বলি এই গ্রামে এক পয়সায় এক কলসী দুধ পাওয়া যেত, তাহলে বিশ্বাস করবে?

'বিশ্বাস করা কঠিন।'

তাহলেই বুঝতে পারছ। পুরোনো দিনের কথা ঠিক গল্প কথার মত। একেই বলে ইতিহাস। তোমাদের যা ইতিহাস পড়ানো হয়, তা আরো প্রাচীন যুগের। সুতরাং আরো বেশী চিত্তাকর্ষক। যদি সেই ভেবে ইতিহাস পড় তাহলে তোমাদের আর খারাপ লাগবে না। শুধু ইতিহাস কেন? অঙ্ক, ইংরেজী, বিজ্ঞান—সব বিষয়েই এই কথাটা খাটে।

পুরোহিত মশায়ের চেহারায় এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। শুনতে আমাদের খুবই ভাল লাগছিল।

পুরোহিত মশায় বলে চললেন "একটা কথা সব সময়ে মনে রেখো— পরকে আনন্দ না দিলে নিজে আনন্দ পাওয়া যায় না, শ্রদ্ধা না দিলে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না আর ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। যে সমস্ত বই তোমাদের স্কুলে পড়ানো হয়, সেগুলোকে শত্রু মনে না করে বন্ধু বলে ভাব। বইএর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হও, বইএর কোথায় কি আছে চিনে রাখ। তাহলেই দেখবে বইও তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। পড়াটাকে খেলা হিসেবে নাও। কি, আমার কথাগুলো তোমাদের ভাল লেগেছে তো?"

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ হেসে বললেন "ঠিক আছে, এতেই কাজ হবে।"

হঠাৎ বাইরে রাঙা পিসিমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল— "ও পরু, ও বয় পুরোহিত মশায় এসেছেন। কম্বল পেতে দে আর এক ঘটি জল এনে দে।"

আমরা তো অবাক। একলাফে বাইরে গিয়ে দেখলাম খিড়কি দরজা দিয়ে রাঙাপিসিমা আসছেন। তাঁর পেছন পেছন আসছেন আর একজন পুরোহিত। এঁরও গলায় পৈতে রয়েছে, কিন্তু ময়লা। চেহারাও লম্বা চওড়া নয়। আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। রাঙাপিসিমা ততক্ষণে দোরগোড়ায় এসে গেছেন। বললেন "হাঁ করে দেখছিস কি? জল নিয়ে আয় এক ঘটি, আসন তো পেতেই রেখেছিস দেখছি।"

পিসিমার কথায় আমাদের চমক ভাঙল। ঠাকুর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি আসন যেমন পাতা ছিল তেমনি আছে কিন্তু সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ সেখানে আর নেই। যেন মন্ত্রবলে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। দেয়ালে টাঙানো ছবিটার সে ঔজ্জ্বল্য আর নেই!

রাঙাপিসিমার তাড়া খেয়ে আমরা ঘটি নিয়ে জল আনতে গেলাম। পুজো শেষ হয়ে যাবার পর আমরা খেয়েদেয়ে রাঙাপিসিমাকে প্রণাম করে স্টেশনের রাস্তা ধরলাম। কিন্তু কি মনে করে আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে আর বললাম না।

ট্রেনে বসে বারবার শুধু এই কথাই আমার মনে হচ্ছিল যে দেশের বাড়িতে যাওয়া আমাদের সার্থক হয়েছে।

—x—

কে-১০০ (৪৪ পৃষ্ঠার পর)

উপর ভর করেছিল, সে আমাকে ছেড়ে গেছে। আমি আবার আগেকার মত ভাল হয়ে গেছি। আমি আপনার কাছেই থাকব।'

দাদু খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তবে আর কি, যাও রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করোগে। এরা আমার অতিথি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললেন, 'ব্যাটা শমরু আমার কালিদাস-১০০ কে দানো বলেছে তোমরা কিন্তু সাক্ষী রইলে। এর জন্য শমরুকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।' আমি হেসে ফেললাম। শমরু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। শুধু সুদীপ্ত আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো—অর্থাৎ কালিদাস-১০০ ব্যাপারটা কি? আমি ইশারায় জানালাম পরে বলব।

—x—

গ্রামের নাম লেঠেল বাড়ী

(৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমাদের ওর সঙ্গে যেতে দেখে ওরা ধরেই নিয়েছে আমরাও একদল বাংলাদেশী স্মাগলার—আজ আমাদের হাতেনাতে ধরবে বলে গাঁয়ের লোকরা ঠিক করেই ফেলেছিল। হাটবার ছিল, সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়েছে—কথা হয়েছে। পঞ্চায়েত ঠিক করে ফেলেছে আজ গ্রামের কী কর্তব্য। আমাদের ধরে ফেলবে বলে ওরা ডেরায় হানা দিয়েছে, কেবল তাই নয়, আগেই লোক চলে গেছে বনগাঁ থানায়। —পুলিস আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস এসে পড়লো। তবে আমাদের জিনিসপত্তর সব ফেরত পেলুম, এবং মুক্তিও! সঙ্গে কলেজের আইডেনটিটিকার্ড ছিল, আমাদের, ভাগ্যিস! সঞ্জীব-রাজীবের বাবাদেরও ভালই চেনেন বনগাঁ থানার অফিসার। তাঁরা বললেন সত্যিই আমরা বড্ড বাঁচান বেঁচে গেছি। বহুদিন ধরেই এই কুখ্যাত স্মাগলার-ডাকাত-দলটাকে খুঁজছিল পুলিস—প্রচুর খুন করেছে এরা, এদের অপরাধের তালিকা মাইল মাইল লম্বা, এই দলে আরো অনেকেই আছে, বাংলাদেশের অপরাধচক্রের সঙ্গে এদের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ।

এরপর গ্রামের লোকেরা লজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে বার-বার মাফ চাইল—এবং আমাদের জন্যেই যে নরহরিদাস ধরা পড়ল, বারবার একথা বলে লেঠেলবাড়ি গ্রামের মোড়লমশায় আমাদের ধন্যবাদ স্বরূপ একটা বড় কুমড়ো দিয়ে বললেন—আরেকবার আসবেন। সেবার দেখবেন, ঠিক মতন যত্ন আত্তি করবো"—বললেন তিনি। শুনেই বাপি বললে—"বাপ্‌রে! গ্রামের নাম লেঠেলবাড়ি! ভাগ্যিস মাথায় লাঠির বাড়ি পড়েনি! বড্ড বেঁচেছি আর নয়। গৌতম বলল—"সঞ্জু, বাপ্‌ধন, খুব 'ইনটিরিয়ার ভিলেজ' দেখিয়েছ বাবা, এবার ভালোয় ভালোয় বিদেয় দাও মা, আলোয় আলোয় ফিরে যাই।"

পরে কাগজে দেখেছি, লেঠেলবাড়ির গ্রামবাসীরা সরকার থেকে পুরস্কৃত হয়েছে বীরত্বের জন্যে। আমাদের অবশ্য কোনো উল্লেখ ছিলনা সেখানে।

—x—

বিঃ দ্রঃ—ছোট বন্ধুরা, চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ পূজা সংখ্যায় (প্রচ্ছদপট নিয়ে) যে প্রতিযোগিতা বেরিয়েছিল, তার উত্তর দেবার শেষ তারিখ **১লা ডিসেম্বর ১৯৮০**। তোমরা ওই তারিখের ভেতর উত্তর পাঠাতে পারো। সঙ্গে অবশ্যই কুপন থাকা চাই।— সঃ. চিঃ. ডিঃ।

ব্ল্যাক-ট্র্যাকারদের আজব কাহিনী

—বীরু চট্টোপাধ্যায়।

অস্ট্রেলিয়ায় একদল বিস্ময়কর মানুষ আছে, যারা আদিম অধিবাসী, তাদের বলা হয় 'ব্ল্যাক-ট্র্যাকার'। অর্থাৎ অপরাধী সন্ধানী। এদের সাহায্য ব্যতিরেকে ওখানকার পুলিস বিভাগের পক্ষে বিশাল এক একটা টেরিটরি সুষ্ঠু শাসনে আয়ত্তে রাখা অসম্ভব। ওদের অপরাধী পাকড়াও করবার ব্যাপারে সাফল্যের মূলে হল এই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কালো মানুষ দল। আমাদের, শুধু আমাদের কেন, সারা বিশ্বে পুলিস বিভাগ অপরাধী-সন্ধানে যেমন শিক্ষিত কুকুরের সাহায্য নিয়ে থাকে, এই আদিম সহজাত অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী লোকগুলো তাদের উপরে সর্বাংশে টেক্কা দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় আসামী পাকড়াও করে ফেলে। এদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সহজাত ক্ষমতায় এরা দুনিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এরা যে কোন দুর্ভেদ্য দুর্গম অঞ্চলে মানুষ অথবা জন্তুজানোয়ারের পদচিহ্ন অনুসরণ করে মাইলের পর মাইল গিয়ে তাদের ধরে ফেলে, যেসব চিহ্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা এবং বোঝা অসম্ভব ঘটনা। এদের এজন্য নাম দেওয়া হয়েছে 'হিউম্যান ব্লাডহাউণ্ড।' এদের কার্যকলাপ না দেখলে সত্যই বিশ্বাস করা কঠিন। এদের চমকপ্রদ দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে মিশেছে এদের অদ্ভুত 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের' ক্ষমতা। এর সাহায্যে এরা প্রায় অদৃশ্য পদচিহ্ন ও অপরাপর দাগ সহজেই দেখতে পায়, বুঝতে পারে।

এই আদিম অধিবাসীদের এই ক্ষমতার 'চাষ' করতে হয় বুঝি এদের জীবনধারণেরই তাগিদে। হাটতে শেখবার সঙ্গে সঙ্গেই এদের যে কোন জীবিত প্রাণীর পদচিহ্ন বা পথ রেখা আবিষ্কারে ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে, অচিরেই তারা প্রথম প্রথম হালকা ধরনের জীবজন্তু, যথা সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটির পদচিহ্ন চিনতে শেখে যা যে কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষের পক্ষে অসাধ্য। তারপর সহজেই শিখে ফেলে ভারী জন্তুর বা মানুষের পদচিহ্ন রেখা যেমন গরুঘোড়া প্রভৃতি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই সব ট্র্যাকার তৈরী হয় যত সব আইনভঙ্গকারী চোর বদমাস খুনে জেলখাটা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে থেকে। এদের মধ্যে "নরহত্যাকারীই" সবচেয়ে বেশি যারা বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তারা পুলিস বিভাগে ঢুকে অপরাপর অপরাধীদের ধরতে সাহায্য করে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রখ্যাত ট্র্যাকার ছিল "নেইবার" নামক দৈত্যকায় জনৈক আদিম অধিবাসী। সে-ই হল একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান আদিম অধিবাসী—যে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক সাহসিকতার জন্য অ্যালবার্ট মেডেলে ভূষিত হয়।

নেইবারকে গবাদি পশুদের বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করার অপরাধে একদা গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে কঠোর ভাবে শৃংখলাবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আঞ্চলিক রাজধানী ডারউইনে। প্রবল বর্ষণে যাওয়ার পথের প্রথম গিরিখাত দুকূলপ্লাবি বন্যায় ভেসে যায়।

এই নেটিভ নিরাপদেই সাঁতরে অপর পাড়ে চলে যায়। কিন্তু পুলিস ট্রুপার যখন ঘোড়ায় চড়ে স্রোতস্বিনীর মাঝখানে গিয়েছে, অকস্মাৎ ঘোড়াটা কাত হয়ে জলে পড়ে গেল। জল থেকে ওঠবার প্রচেষ্টায় সে ট্রুপারের মাথায় এক প্রচণ্ড লাথি হাঁকড়ে বসে, ফলে সে মূর্চ্ছিত হয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায়। নেটিভ আসামী অনায়াসে সেই ট্রুপার পুলিসকে মরণের মুখে রেখে নিরাপদে হাওয়া হয়ে যেতে পারত কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা সে তার শত্রু পুলিস অফিসারের বিপদ দেখে তন্মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিকষ্টে ট্রুপারকে ডাঙ্গায় টেনে তুলে প্রাণ বাঁচায়। ওর শৃংখলাবদ্ধ অবস্থা বিবেচনা করলে এটাকে একটি অসাধারণ বীরত্বের কাজ বলে অভিহিত করা যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থেকে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়া হল এবং তদানিন্তন সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাকে অ্যালবার্ট মেডেলে ভূষিত করেন। এরপরেই নেইবার-এর জীবনধারা পালটে যায়, আর তাকে নিযুক্ত করা হল অফিসিয়াল ট্র্যাকার হিসেবে। পরবর্তী সময়ে অপরাধী গ্রেপ্তারে তার রেকর্ড অতুলনীয়। এ ধরনের ট্র্যাকারের খপ্পরে পড়লে কোন ক্রিমিনালেরই আর রেহাই পাবার উপায় থাকে না। তারা যদি তাদের পদ ও পথ চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করবার যাবতীয় চেষ্টা করে, তবুও নয়। কেননা এ সব তথাকথিত গুণীরা শুধুমাত্র ভূমির দাগের উপরই নির্ভর করে না।

এ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নর্দার্ন টেরিটরিতে ভিক্টোরিয়া রিভার ডিস্ট্রিক্ট-এর একটি স্টেশন থেকে তিনশ গবাদি পশু চুরি হয়ে যায় একদা। চোরেরা ঐ জন্তুগুলোকে পর্বত সঙ্কুল বন্ধুর প্রদেশ দিয়ে টেরিটরির অভ্যন্তরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এরা পনের দিনের পথ এগিয়ে যাবার পর, স্থানীয় ট্রুপাররা এই নেটিভ "ব্লাডহাউণ্ডদের" নিয়ে অকুস্থলে এসে শুরু করে চোরদের পশ্চাদনুসরন।

ক্রিমিনাল গরু চোরেরা ছিল অতি ধূর্ত, তারা তাদের পদ ও পথ চিহ্ন বিলোপ করবার উদ্দেশ্যে, পথে জঙ্গলে পুড়িয়ে, গাছ সড়ান ফেলে এবং আরো কয়েক প্রকার অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করতে করতে এগিয়ে যায়। এর উপর প্রবল বর্ষণ শুরু হয় যখন ট্রুপাররা চোরেদের পেছু নেয়। প্রথমটা ট্রুপারের মনে হয়েছিল যে ঐ গরু চোরদের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার ট্র্যাকাররা উলটো কথা বললে। তারা নিশ্চিত যে গরু চোরদের ধরবেই ধরবে। আর তারা তাদের অলৌকিক ক্ষমতাবলে ট্রুপারকে প্রায় অবিশ্বাস্য দেড়শ মাইল পথ নিয়ে গিয়ে গবাদি পশুদের হস্তান্তরিত করবার পূর্বেই চোরদের ধরে ফেললো।

তাহলে কি উপায়ে ওরা চোরদের পদরেখা ধরে ফেলেছিল? শুধু তাদের মার্ভেলাস নিরীক্ষণ শক্তির মাধ্যমে এখানে সেখানে ঝোপ ঝাড় দেখে, পথচ্যুত পাথরের নুড়ি দেখে, পাথরের উপর সূক্ষ্ম আঁচড়চিহ্ন অথবা পশুদের ক্ষুরের চিহ্ন পর্যবেক্ষণ ক'রে। কোন শ্বেতাঙ্গের সাধ্য ছিল না এ কাজ করবার।

প্রায়শঃই যখন ট্র্যাকার অনুসরণ করে, তখন ঘোড়ায় আসীন থাকলেও তাদের তীক্ষ্ণ নজর থাকে সব কিছুর দিকে। সমস্ত কিছুর পানে লক্ষ্য রেখে, পথচিহ্ন বোঝবার চেষ্টা করে। এখানে সেখানে দলিত ঘাস, কিছু ভাঙা ডাল, এমন কি পিষ্ট পিঁপড়ের দলের প্রতিও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এসব দেখে এর গূঢ়ার্থ প্রায় তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে তারা।

কিছুকাল পূর্বে এই কালো ট্র্যাকারদের অভূতপূর্ব কার্যকলাপ দৃষ্ট হয়েছে ওয়েস্টার্ন কুইন্সল্যাণ্ডে। পর পর সেখানে কতগুলো মারাত্মক চুরি সংঘটিত হয়, কাপড়ের দোকানে, জুয়েলারি শপ-এ, ধূমপানের ব্যবসায়ীর আড়তে। পুলিস বিভাগ কিছুতেই চোরকে ধরতে না পেরে বিহ্বল হয়ে যায়। বহু ডিটেকটিভ এ সবের তদন্তে লেগে থাকা সত্ত্বেও কোন গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় না।

এর পর ট্র্যাকাররা নেমে পড়ে এবং তাদের অসাধারণ নিরীক্ষণ শক্তির প্রসাদে—একসময় ক্রিমিনাল পাকড়াও হয়ে যায়!

একদিন পুলিস স্টেশনে একজন লোক এসে জানায় যে শহর থেকে মাইল দশেক দূরে অবস্থিত তার ফার্মের একটা লাগোয়া জমিতে জনৈক রহস্যজনক মানুষ এসে ক্যাম্প করেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিস অফিসার একজন ট্র্যাকারকে নিয়ে সে স্থানে রওনা হয়ে যায়।

সন্দেহজনক ব্যক্তির ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে তারা দেখতে পায় সেই লোকটা লোডেড রাইফেল পাশে নিয়ে গভীর ভাবে ঘুমচ্ছে। সন্তর্পণে তার রাইফেলটাকে হস্তগত করে অফিসার লোকটাকে জাগিয়ে তোলে। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলে পুলিস অফিসারটি তাকে একজন 'ভবঘুরে' ভেবে

(পরের অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়)

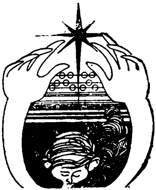

ক্ষুদে গোয়েন্দা

কণা বসুমিত্র

টাটুদের বাড়ির সামনেই একটা দর্জির দোকান। সারাদিন সেখানে শেলাই হয়। একটা বুড়ো মতন দর্জি বসে বসে পা মেসিন চালায়। তার মাথার চুলগুলো আগাগোড়া তামাটে। চোখের মণিদুটো বাদামী। সে দাড়ি কামায় না প্রায়ই। গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে থাকে। দোকানের সামনে খানিকটা খালি জমি। একটা দুটো বাড়ি উঠেছে। এখনো কিছুটা জায়গা ফাঁকা থাকায় টাটুরা সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট খেলে।

খেলতে খেলতে অনেক সময় টাটু যখন এলোমেলো এদিক ওদিক তাকায়, তখন ও দেখে, বুড়োটা চশমা জোড়া নাকের ডগায় ঝুলিয়ে ত্যারছা চোখে তাকেই দেখছে।

ওটা শুধু দর্জির দোকানই নয়, ওটা স্যাকরার দোকানও বটে। বুড়ো দর্জির ঠিক পেছন দিকেই বসে বসে আর একটা লোক আগুন জেলে সোনা গলায়। সে তার ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে আওয়াজও করে।

টাটুদের বল যদি ছিট্‌কে গিয়ে কখনো ওই দোকানটার মধ্যে পড়ে, তাহ'লে ওই দর্জি আর স্যাকারাটা দুজনেই ক্ষেপে লাল হয়।

বল তো আর মানুষ নয়? সে কেন কথা শুনবে? টাটুরা যতই সাবধানে খেলুক, বলটা তবু ছিট্‌কে চলে যায় বুড়ো দর্জিটার দোকানের ভেতরে।

টাটু বল কুড়োতে গেলেই দর্জি আর স্যাকরাটা দারুণ চমকে ওঠে। স্যাকরাটা তাড়াতাড়ি কি যেন লুকোতে ব্যস্ত হয়। টাটু এটা অনেক সময় লক্ষ্য করে।

টাটুদের বাড়ির সামনের গলির মধ্যে আর একটা অদ্ভুত মানুষকেও প্রায়ই দেখে টাটু। রোজই ঠিক ভর দুপুরে লোকটা গলির মধ্যে দিয়ে হেঁকে হেঁকে যায়, "পুরনো খবরের কাগজ আছে? কা-গ-জ? ভাঙা পেতল, ভাঙা কাঁসা, ভাঙা কাঁচের বোতল?"

টাটুর সকালে স্কুল। অতএব দুপুরে সে বাড়িতেই থাকে। মা, বাবা, দুজনেই অফিসে চলে যান। বাড়ির অনেক দিনের পুরনো কাজের লোক সুখাইদাদা। সে তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

সুখাইদাদা নামেও সুখাই, কাজেও সুখাই। সে যখন ঘুমোয়, তখন তার মত সুখী আর কেউ নেই। এই লম্বা দুপুরগুলো টাটুর পক্ষে একা কাটানোই কষ্টকর হ'য়ে ওঠে।

টাটু তখন গুল্‌তি দিয়ে পাখীর গায়ে তাক্ করে। অথবা প্রসন্নর মত বল করতে গিয়ে জানলার কাঁচ ভেঙে ফেলে, আলমারীর কাঁচ ভেঙে ফেলে। কিংবা দেওয়ালে বল মেরে বোমার মত শব্দ তুলে বাড়ি কাঁপিয়ে দেয়। কুম্ভকর্ণ সুখাই দাদার এতে অবশ্য ঘুমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না।

সেদিন দুপুরবেলা টাটু হঠাৎ দেখে, সেই পুরনো-কাগজ-কেনা লোকটার ঝোলা গোঁফটা ঝুপ করে পড়ে গেল গলিতে। লোকটা চারিদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঝোলার মধ্যে

থেকে একটা আঠার টিউব বার করল। নাকের তলায় একটু আঠা লাগিয়ে মুহূর্তে গোঁফটা লাগিয়ে লোকটা তাড়াতাড়ি দর্জির জানলার কাছে এগিয়ে গেল।

দর্জিটা জানলার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ তাদের দেখছে কি না। আশে পাশে বাড়ির লোকেরা তখন জানলা, দরজা বন্ধ করে ফ্যান্ চালিয়ে তোফা ঘুম লাগিয়েছে গরমের দুপুরে। তাই কে আর ওঁৎ পেতে বসে থাকবে ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখবার জন্যে? সবাই তো আর টাট্টু নয়।

কাউকে কোথাও দেখতে না পেয়ে দর্জিটা জানলার মধ্যে দিয়ে রাজ হাঁসের মত গলা বাড়িয়ে কি যেন বলছে কাগজ-অলাটাকে। ওরা জানতেও পারছে না উল্টোদিকের বাড়ির জানলার কপাট সামান্য ফাঁক করে একটি ছোট্ট ছেলে কেমন করে ওদের দেখছে। ব্যাপারটা টাট্টুর কাছে বেশ জটিল বলে মনে হয়।

দিন দুয়েক পরে, টাট্টু ফের দেখে, সেই পুরনো কাগজ-অলাকে তাদের গলির মধ্যে ঢুকতে। টাট্টুদের বাড়ি দমদম অঞ্চলে। তখন বোধহয় গোটা দুয়েক বাজে। কাছেই স্টেসন। একটা লোকাল ট্রেন হুশ্ হুশ্ করে চলে যায়। আর তার দাপটে টাট্টুদের গলিটাও দপ্ দপ্ করে কেঁপে ওঠে।

টাট্টু তখন ছাদে দাঁড়িয়ে গুল্তি দিয়ে পাখী মারার চেষ্টা করছে। ওকে দেখা মাত্রই নিজের কাজ বন্ধ রেখে টাট্টু তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে জানলার পাশে।

লোকটা যথারীতি তার হাঁকডাক সেরে চারিদিকে তাকায়। তারপর চুপি চুপি সেই দর্জির জানলার কাছে এগিয়ে যায়।

টাট্টুর জন্মদিনে তার দাদু একটা বক্স ক্যামেরা দিয়েছিলেন তাকে। বাবার কাছে থেকে ছবি তোলাও শিখেছে টাট্টু। তবে টাট্টুর তোলা ছবিগুলোয় কোনটায় মানুষটার মাথা কাটা যায়, কোনটায় মাথা থাকে, কিন্তু ধড়টাই পুরো বাদ হয়ে যায়। নিজের তোলা ছবিগুলো দেখে টাট্টু আজকাল লজ্জাই পায়। তবু টাট্টু ছবি তুলে যায় তার মায়ের, বাবার, সুখাইদাদার।

টাট্টুর এই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ক্যামেরাটার কথা। ফিল্ম আছে তো? হ্যাঁ আছে। এই তো ক'দিন আগে মামার বাড়ি গিয়েও দাদু, দিদির ছবি তুলেছিল। মামাতো বোন রিন্কীর ছবিও তুলেছিল। বাকীগুলো ও রেখে দিয়েছিল কিছু রোমাঞ্চকর ছবি তুলবে বলে। ওর মনে হয়, তার চেয়ে এই ছবিটা কম জরুরী নয়। ক্যামেরা নিয়ে ছাদের ওপরে চলে যায় টাট্টু।

হ্যাঁ, এইবার, ঠিক এই পজিসনে।

দর্জিটার কানে কানে কথা বলছে পুরনো কাগজঅলাটা. স্যাকরাটা কি যেন ভরে দিচ্ছে কাগজঅলাটার ঝোলায়। বাহ্, চমৎকার। এসব শট্ খুব কাজে লাগবে, বন্ধুদের কাছে ও যখন বানিয়ে গোয়েন্দা গল্প করবে।

বড় রাস্তার মোড়ে সেদিন এক হই হই কাণ্ড। কি? না একটা চোর ছুটে পালাচ্ছে। তার পেছন পেছন ছুটছে পাড়াশুদ্ধ লোক। চোরটা নাকি একটা বাড়ির গড্রেজের তালা অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে ফেলেছে।

খানিক দুর যেতে না যেতেই চোরটা ধরাও পড়ে যায়।

ভিড়ের মধ্যে টাট্টুও ঢুকে পড়ে চোর দেখতে। চোরের মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে? টাট্টু মুচ্কি একটু হাসে। টাট্টু ছুটে গিয়ে ক্যামেরাটা নিয়ে আসে। ও ক্লিক্ করে তুলে নেয় চোরের মুখটা।

টাট্টুর কাণ্ড দেখে সবাই হাসে। বেদম পিটিয়ে শ্রীমান চোরকে তো শ্রীঘরে চালান করে দেওয়া হয়। কিন্তু গলির চুরি বন্ধ হয় না। এ বাড়ি, সে বাড়ি থেকে নানা চুরির খবর আসে। টাট্টু দর্জি, স্যাকরা, আর কাগজঅলার ছবিগুলো অ্যালবামে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ওর মনের সন্দেহের কথা ও কাউকে বলে না। তবে টাট্টু আজকাল প্রায়ই একশো নম্বরে ডায়াল করে। "হ্যালো! লালবাজার?"

টাট্টুর মা বলেন, "কিরে তুই কার সঙ্গে এত কথা বলিস?"

ও গম্ভীর চালে বলে, "পুলিসের সঙ্গে।"

"পুলিস? সে আবার কি?"

"সে আবার কি মানে? তুমি কি পুলিসের নাম শোননি মা?"

"তা শুনবো না কেন? কিন্তু তুই পুলিসের···?"

টাট্টু হেসে থামিয়ে দেয় মাকে। "হ্যাঁ, পুলিসদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। ওরা আমার বন্ধু।"

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়)

ভ্যাম্পায়ার

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

সে আছে।

শহরের ভীড়ে তাকে দেখা যায় না।

সকালে কাকু যখন আলতো ধাক্কা দিয়ে বলে : 'ওঠ, টুটুল, ওঠ', আড়মোড়া ভাঙতে দাঁত মাজতে দুধ খেতে ইস্কুলের ড্রেস পরতে একটু দেরী হলে মা যখন দারুণ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, টুটুলকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে কাকু যখন সামনের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দড়ির আগুনে সিগারেট ধরায়, অঙ্কের ক্লাসে একটা ভুল হলেই টাকমাথা বিরিঞ্চি সার যখন টুটুলকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয়, টিফিনের সময় টিফিনবক্সটা খুলে শ্রেফ রুটি আর একটা কলা দেখে টুটুলের যখন কান্না পায়, ইস্কুলে তারই পাশে বসে বড়লোকের ছেলে অতীন যখন একবার নিজের দামী জামাপ্যান্ট একবার টুটুলের সস্তা জামাপ্যান্ট দেখে বলে, এতো খেলো কাপড়ে ড্রেস করালি কেন, ইস্, তোর কোন পছন্দ নেই···টুটুলের যখন সরে যেতে হয়, তখন, তখনও সে অতীনকে আড়াল করে টুটুলের সমেনে এসে দাঁড়ায়না।

ছুটির দিনে সকালে বাবা খবরের কাগজটা সামনে মেলে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে। 'দেশ এগিয়ে চলেছে'—মস্ত বড় বড় অক্ষরে লেখা। 'বলেছেন –'। নীচে সাদা-কালো চুল, মাথায় আধো-ঘোমটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—একটা ছবি। বাবা দেখে, একসময় কাগজটা রেখে বাজারে যায়, হাতের থলিটা নামিয়ে রেখে বলে, "কি কিনবো ? বাজার আগুন !!' ···মা মুখ ভার করে, মুখ ঝামটা দেয়, ঝগড়া করে। ···কোনদিন বিকেলে কাকু ওকে বেড়াতে নিয়ে গেলে সেই মেয়েটা, স্বাতী যার নাম, যার সঙ্গে কাকুর বিয়ে হবে, সে টুটুলকে টুটু বলে ডাকে : সেও মুখ ভার করে, বলে : 'স্বপন, সবার চাকরি হয়, তোমার হয়না ?' ···সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে কাকুকে দেখে বাবারও মুখ ভার হয়—"এবারও হলনা ? এল্. সি না পড়ে যদি অন্য কিছু পড়তিস্, অন্তত টিউশনি করে দুটো টাকা কামাতে পারতিস। আর কতোদিন ঘানি টানবো তোদের, বলতে পারিস ·· ?" বাবার কথার মাঝখানে মা যখন ঝাঁঝিয়ে ওঠে—"তোমার আদরের ভাই টিউশনি করবে, তাহলে সিনেমা দেখবে. সিগারেট খাবে, ময়দানে স্বাতীর সঙ্গে ঘুরবে, বেড়াবে কে ?" টুটুলের তখন বড্ড খারাপ লাগে, তখন, তখনও সে আসেনা।

সে আসে।

যখন রাত নিশুতি হয়, যখন কাকুর নিঃশ্বাসের শব্দ, রান্না-ঘরের ফুটো কল থেকে জল ঝরার টুপ টুপ শব্দ, মাঝে মাঝে বড় রাস্তায় ট্রাকের ঘরঘর ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, যখন টুটুলের চোখদুটো ঘুমে বুজে আসে···

ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে সে আসে।

দুপাশে রুপোলী ফার গাছের ঝাড়, পাথুরে রাস্তা বেয়ে টগবগ ছুটে চলে তেজী দুটো ঘোড়ায় টানা গাড়ি। পাতা ঝরে। পপলারের সবুজ পাতা। লাইম গাছের হলদে পাতা। পাহাড়ের ওপরে তপ্ত দুধের মত সাদা কুয়াশা। তারই আড়ালে ফুটে ওঠে বিশালগড়ের দুর্গ। মেঘের মত মিনার। বার্চ আর মেপল গাছের মাথায় দুর্গের চুড়ো। তারও আড়ালে পশ্চিমে ঢলে-পড়া সূর্য।

ঘোরানো সিঁড়ি। কালো পাথরের সিঁড়ির ওপরে নরম কি যেন বিছোনো। পা ডুবে যায় যেন। ঘোরানো সিঁড়ি

(শেষাংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়)

ক্ষুদে গোয়েন্দা (৫২ পৃষ্ঠার পর)

টাট্টুর মা সেদিন দেখেন, টাট্টু টেলিফোনে পুলিসকে একটার পর একটা ছড়া শুনিয়ে যাচ্ছে। ছড়া শেষ হ'ল তো গান শুরু হ'ল। শেষপর্যন্ত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে"...।

টাট্টুর রকম সকম দেখে মা তো হেসেই খুন।

কদিন পর ক্ষুদে গোয়েন্দা টাট্টুদের বাড়িতেই চুরি হয়ে যায়। ওর বাবা তো থানা, দারোগা নিয়ে ব্যস্ত, আর মা তার গয়নার শোকে পাগল।

পাড়ার লোক এসে জড় হয় টাট্টুদের বাড়ি। খবরটা চাট্‌নীর মত পরিবেশন করেন একে অন্যকে।

অনেকেই বলেন, "চুরিগুলো এমন অদ্ভুতভাবে হচ্ছে যে পরিষ্কার বোঝা যায়, কোন জানা শোনা চোরেরই কাজ।

টাট্টু কোন কথায় থাকে না। ও সোজা একশ নম্বরে ডায়াল করে।" "হ্যালো! লাল বাজার? লালবাজার?"

সবাই আশ্চর্য হয়ে শোনে, টাট্টুর কথা। "পুলিস কাকু, এবার আমাদের বাড়িতেই চুরি, এক্ষুনি চলে এসো।"

ওদিকে টাট্টুর বাবা থানার ওসি আর দুজন কনেস্টবলকে নিয়ে এসেছেন। ওঁরা সবাই বাড়ির কাজের লোকেদের নানা জেরা করছেন। ঠিক তেমনি মুহূর্তে লালবাজারের ভ্যান এসে হাজির।

একগাল হেসে টাট্টু এগিয়ে যায় তার পুলিসকাকুর সামনে। ও অ্যালবামটা তুলে দেয় ওর কাকুর হাতে। পুলিস কাকুকে চিনতে অবশ্য টাট্টুর কষ্ট হয় না। উনি তো দিনদুয়েক আগেও এসে ওর সঙ্গে দেখা করে গেছেন গলির মোড়ে।

টাট্টু তখন ক্রিকেট খেলছিল। পুলিসকাকু ছদ্মবেশে এসে টাট্টুকে ডেকেছিলেন। তারপর একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার পুলিস কাকু, টাট্টু। তোমায় চিনে নিতে এলাম।"

"তুমি যে পুলিসকাকু তার প্রমাণ? টাট্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল। পুলিসকাকু একটু হেসে পকেট থেকে বের করেছিলেন তাঁর আইডেনটিটি কার্ড। পুলিসের পোশাকে পুলিসকাকুর সঙ্গে এই মানুষটির চেহারার হুবহু মিল।

পরে বন্ধুরা যখন জিজ্ঞেস করেছিল,"ওই ভদ্রলোক কেরে টাট্টু? টাট্টু গম্ভীরভাবে বলেছিল, "উনি লালবাজারের পুলিস।" বন্ধুরা বলেছিল, "বেশ বানিয়ে গল্প বলিস তো তুই।" টাট্টুর কথা ওরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

আজ কিন্তু পুলিস ভ্যান থেকে পুলিসের পোশাকে ওই ভদ্রলোককে নামতে দেখে, তার বন্ধুরা সত্যিই হকচকিয়ে যায়। এমন কি টাট্টুর মা, বাপ, থানার ওসি, কনস্টেবল পর্যন্ত। টাট্টু ভারিক্কী চালে হ্যাণ্ডসেক করে তার পুলিসকাকুর সঙ্গে। ওর ছবির অ্যালবামটা খুলে ও দেখায় পর পর সাজিয়ে রাখা ছবিগুলো।

এক নম্বর, পুরনো কাগজওলার গোঁফ খুলে যাওয়া।

দু নম্বর, আঠা দিয়ে গোঁফ লাগিয়ে নেওয়া।

তিন নম্বর, সেদিন গলির মধ্যে ধরা পড়া চোবটার মুখ।

পরের পাতায় আঁটা সেই ছবিগুলো, যে ছবি গুলোতে ছদ্মবেশী কাগজওলার সঙ্গে দর্জি কানে কানে কথা বলছে।

দ্বিতীয় ছবিতে স্যাকরা তার ঝোলাতে চুপি চুপি কি যেন ফেলে দিচ্ছে। দর্জির চোখের ইসারা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ছবিতে। তবে তার মাথার আদ্ধেক কাটা গেছে। যদিও তাতে কোন অসুবিধে নেই। কেননা তার ঘরের ছবিগুলোয় দর্জির মাথা পরিষ্কার উঠেছে। স্যাকরাকে চিনতেও অসুবিধে নেই।

পুলিসকাকু কোন কথা না বলে, সোজা গিয়ে স্যাকরা আর দর্জিকে অ্যারেস্ট করেন। তাদের দোকান সার্চ করে পাওয়া যায় চোরাই গয়না আর কিছু টাকা পয়সা।

পরদিন খবরের কাগজে টাট্টুর ছবি ওঠে। ক্ষুদে গোয়েন্দা টাট্টুর কীর্তি পড়ে লোকে তো তাজ্জব বনে যায়। সরকার থেকে টাট্টুকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। টাট্টুর পুলিসকাকু ওকে আলাদা করে উপহার দেন একটা দারুণ ক্যামেরা।

ভ্যাম্পায়ার (৫৩ পৃষ্ঠার পর)

কোথায় নেমে গেছে? পাতালপুরীতে? যেখানে কফিনে শুয়ে আছে মরা মানুষ। কাকার মত না, বাবার মত না, টাকমাথা বিরিঞ্চি স্যারের মতও না। আলাদা, অন্যরকম। মরা, তবু মরার মতও না। জ্যান্ত, যেন ঘুমিয়ে আছে। ওর মুখের কষে রক্তের দাগ। ওর একটা দাঁত অস্বাভাবিক বড় অদ্ভুত ছুঁচোলো। লম্বা মুখ, বড্ড ফ্যাকাসে। পরনে কালো পোশাক, মাথায় কালো চুল। সুন্দর। অথচ ভয়ংকর।

রোদের আলোর শেষ ঝিলিকটা মিলিয়ে যেতেই কফিনের ঢাকা খুলে যায়। মরা মানুষ কফিন থেকে উধাও। মরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মুখে। দুর্গের ভেতরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে টুটুল। জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে মরা মানুষ। এগিয়ে আসছে টুটুলের দিকে। বিশালগড়ের দুঃশাসনকে কি করে ঠেকানো যায়। বুকে রূপোর ক্রস ঠুকে দিয়ে, রূপোর বুলেট বুকে বিধিয়ে?

রূপো কোথায় পাবে, ক্রস কোথায় পাবে, বুলেট কোথায় পাবে বেচারা টুটুল? বিশালগড়ের দুঃশাসন হাঁ করেছে। একটা দাঁত অস্বাভাবিক বড় আর সূচোলো। ধারালো দাঁতটা টুটুলের ঘাড়ে বিঁধতে যাচ্ছে !!! না !!! না !!!

…আচমকা ঘুম ভেঙে যায় টুটুলের।

সে আছে।

বিশালগড়ের দুঃশাসন, ড্রাকুলা, ভ্যাম্পায়ার।

কাকু টুটুলকে কিনে দিয়েছে হেমেন রায়ের বই। ব্র্যাম্ স্টোকারের গল্প শুনিয়েছে। সিনেমার গেটকীপারকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে টুটুলকে দেখিয়েছে 'হরর অফ ড্র্যাকুলা' সিনেমায়। ওটা নাকি ছোটদের দেখতে নেই।

সে আছে।

দিনের বেলায় সে কফিনে শুয়ে থাকে। রাতে সে জেগে ওঠে, ঘুমন্ত মানুষের রক্ত শুষে নেয়। রক্তশূন্য মানুষটা একদিন মরে। মরে ভ্যাম্পায়ার হয়।

সে আছে।

কিন্তু কাকু বদলে যাচ্ছে। আগের মত হাসেনা, টুটুলের সঙ্গে ছুটোছুটি করেনা, একটু জোরে হাঁটতে গেলে কেমন যেন হাঁফায়। মা আজকাল কাকুকে হাতখরচের পয়সাও দেয় না। কাকু, তবু সিগারেট খায়, টুটুলকে চকোলেট কিনে দেয়, সিনেমা দেখায়। কাকু পয়সা পায় কোথা থেকে?

কাকু কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

বড্ড ফরসা, বড্ড ফ্যাকাসে। জানলা দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়ছে। সেই আলোয় দেখছে টুটুল। আজকাল কাকু কি দিন দিন ফরসা হচ্ছে? কাকু ফুলহাতা সার্ট পরে সবসময়, আজকাল হাত গুটোয় না। এখন সার্ট খুলে গেনজি পরে ঘুমুচ্ছে। কাকুর হাতে, কনুইয়ের সামনে: ওটা কিসের দাগ? শিরার ওপরে—একটা, দুটো, তিনটে দাগ…নীল, না, ঠিক নয়, নীলচে বাদামী…ওরকম দাগ কোথায় যেন দেখেছে টুটুল?

সিনেমায়।

হ্যাঁ, ড্রাকুলা রাতে ঘাড়ের শিরায় দাঁত বসিয়ে রক্ত শুষে নিল। সকালে ঘুম ভেঙে সেই মিষ্টি মেয়েরা দেখলো, আয়নায় দেখলো, তার ঘাড়ে এমনি দাগ।

ভ্যাম্পায়ার?

ভ্যাম্পায়ার কাকুর রক্ত শুষে নিচ্ছে?

তাই অতো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কাকু?

কাকু জানেনা?

টুটুল তবে বলবে? না, তার চেয়ে…

…'বৌদি, রুমালটা কোথায় গেল?'…গজগজ করছে কাকু। 'কেন? সাতসকালে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? রুমালের খোঁজ পড়লো কেন?'—মায়ের হাসিটা বড্ড বিশ্রী, বড্ড বাজে। মায়ের কষের একটা দাঁত কি বড়, ভ্যাম্পায়ারের মত?

…'দেশ এগিয়ে চলেছে। বলেছেন—', কাগজে ঘোমটাপরা মিষ্টি মুখ, লম্বাটে, মাথায় সাদাকালো চুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। উনি হাসছেন। একটা দাঁত কি একটু বড়?

…'তোকে ইন্টারভিউয়ে কি ধরেছিল রে?'—রাস্তার মোড়ে কাকুর বন্ধু বিভূতি জানতে চাইছে। 'অ্যাঙ্গোলার রাজধানী, অ্যামেরিকার সাত নম্বর প্রেসিডেন্টের নাম, ডন ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট ছাড়া আর কি খেলতো'—বেজার মুখে বলছে কাকু— 'একটাও বলতে পারলাম না রে।' বিভূতি হাসছে, বলছে— 'ধরাকওয়া ছাড়া চাকরী হয়? আমার ভেতরে লোক

ছিল, হয়ে গেল'—বিভূতি হাসছে। ওর একটা দাঁত কি বড্ড লম্বা, বড্ড সুচোলো? ইন্টারভিউয়ে যেসব বড় সাহেব ওইসব আজব সওয়াল করে, তারা মানুষ না ভ্যাম্পায়ার?

…ময়দানে বটগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। কাকু আর সেই মেয়েটা: ফর্সা, খুব ফর্সা, লম্বাটে মুখ, কালো চুল—স্বাতী যার নাম। ওরা চাপা গলায় কথা বলছে। চীনেবাদামের খোসা ছাড়ানো বন্ধ করে শুনছে টুটুল। স্বাতী বলছে—"অঘ্রাণ মাসে আমার বিয়ে। বড় ডাক্তার। কিছু মনে কোরোনা স্বপন, তোমার তো চাকরি হল না…বিয়েতে এসো, কেমন?"

খুব নরম, খুব মিষ্টি একটা হাসি হাসলো মেয়েটা। একটা দাঁত যেন অস্বাভাবিক লম্বা, অস্বাভবিক সুচোলো মনে হল……

…অনেক লোক ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এসেছে কাকুকে। বাবা কাঁদছে, মা চুপ করে আছে। বাবা বলছে—'রাস্তায় হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে ডাক্তারকে বলেছে, প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কে হপ্তায় হপ্তায় রক্ত দিতো রক্তের দামে হাত খরচ চালাতো।

হারামজাদা, একবার আমাকে বললেও তো পারতিস!'

…প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্ক……টাকার বদলে কি হপ্তায় রক্ত শুষে নেয়, মানুষটা মরলো কি বাঁচলো…ওরা কি ভ্যাম্পায়ার? ওদেরও একটা দাঁত কি দারুণ ধারালো, অদ্ভুত সুচোলো?

একদিন টুটুল বড় হবে। তখন সে জোগাড় করবে রূপোর ক্রস। অনেক, অনেকগুলো। এতগুলো ভ্যাম্পায়ারকে মারতে হবে যে। প্রত্যেকটা ভ্যাম্পায়ারের বুকে ক্রস সেটে দিয়ে টুটুল বলবে—'বিশালগড়ের দুঃশাসন ড্র্যাকুলা, ভ্যাম্পায়ার, তোমরা মরো, আমাদের বাঁচতে দাও!'

…টুটুলদের খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে। নইলে ভ্যাম্পায়ার মরবেনা, মানুষও বাঁচবেনা।

—

(৫০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

গ্রেপ্তার করবে স্থির করে। হয়ত উক্ত চুরির ব্যাপারে লোকটার হাত থাকতে পারে ভেবে পুলিস অফিসার তখন ট্র্যাকারকে চারদিক তন্ন তন্ন করে তল্লাসী কার্যে পাঠায়, কিন্তু তাতেও অপহৃত কোন বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। অফিসার তখন আসামী সহ রওনা দেবার উদ্যোগ করছে এমন সময় ট্র্যাকারের উল্লসিত এক চিৎকার শোনা যায়। সে হাঁটুগেড়ে একটা পিঁপড়ের ঢিবি নিরীক্ষণ করছিল তখন।

পুলিস অফিসার কাছে যেতে নেটিভ ট্র্যাকার দেখালো যে লাইন করে পিঁপড়েরা চলেছে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে রয়েছে সাদা চিনির টুকরোকণা। এরা আসছে ক্যাম্পের পেছনের কোন এক স্থান থেকে। পিঁপড়েদের লাইন অনুসরণ করা হল আধ মাইল টাক পথ। সেখানে গিয়ে দেখা গেল লাইনটা আসছে একটা বড়গাছের গুঁড়ির গর্ত থেকে। সেখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল চুরি যাওয়া অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রী, যাদের মূল্য কয়েকশত পাউণ্ড। লুঠের মালের মধ্যেকার একটি চিনির ব্যাগ কেটে যাওয়ায় পিঁপড়েরা সেখানে হামলে পড়ে, ফলে এই বিপত্তি। ফলে চোরেরা ধরা পড়ে যায়।

অধিকাংশ ট্র্যাকারদেরই দারুণ স্মৃতিশক্তি। তারা তাদের পরিচিত যাবতীয় মানুষজনের পায়ের ছাপ আলাদা আলাদা করে বলে দিতে সক্ষম। এ ব্যাপারে নর্দার্ন টেরিটরির জনৈক পুলিস অফিসার একটি কাহিনী বলেন।

একদিন তিনি একজন ট্র্যাকারকে নিয়ে ঘন বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সহসা ট্র্যাকার থেমে পড়ে মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, দেখুন সার, এই যে পায়ের ছাপগুলি এগুলো হল আমার বাবা এবং মায়ের। শ্বেতাঙ্গ অফিসার কিছুই বুঝতে পারলেন না। ট্র্যাকার আরও বলে ওঠে যে তার মা বাবা একটা এ মুর পেছন পেছন গিয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ ছোকরা সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে প্রায় মাইল খানেক দূরে গিয়ে দেখা গেল সত্যি সত্যিই তার

(শেষাংশ ৫১ পৃষ্ঠায়)

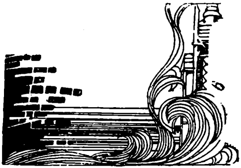

দু'হাজার বছর ব্যাপী টিটকিরি!

অদ্রীশ বর্ধন

[ফিনিসিয়ানরা আফ্রিকা বেড় দিয়েছিল এবং তা প্রমাণও করেছিল : দুর্জয় সাহস আর দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের চমকপ্রদ কাহিনী !]

পর্তুগীজরা পূর্ব আফ্রিকা আবিষ্কার করার দু'হাজার বছর আগে ফিনিসিয়ানরা কালো মহাদেশ আফ্রিকাকে এক পাক ঘুরে এসেছিল সুয়েজ থেকে আরম্ভ করে জিব্রাল্টার অন্তরীপ পর্যন্ত—কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করে নি।

বিশ্বাস তো করেই নি, বরং ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল যখন ফিনিসিয়ানরা বলেছিল আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত বেড় দেওয়ার সময়ে মধ্যদিনের সূর্য হেলে পড়েছিল তাদের উত্তরদিকে। প্রাচীন দুনিয়ার সব মানুষেরই তখন বিশ্বাস ছিল, সূর্য থাকে সব সময়েই আকাশের দক্ষিণ অর্ধাংশে। ধারণাটা মিথ্যে নয় মোটেই—ভূগোলকের উত্তর গোলার্ধে যারা থাকে, তাদের কাছে মধ্যদিনের সূর্য সবসময়েই হেলে থাকে আকাশের দক্ষিণ দিকে।

১৫০ বছর পরে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ফিনিসিয়ানদের এই কাহিনী লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন —সব বাজে, ধাপ্পা। ফিনিসিয়ানরা ধোঁকা দিয়েছে। ফিনিসিয়ানরা কিন্তু সত্যিই আফ্রিকা বেড় দিয়ে এসেছিল।

আধুনিক যুগের পণ্ডিতরা তাদের কাহিনীর খুঁটিনাটির মধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন অভিযানের সত্যতার—অথচ এই বিশদ বিবরণটাকেই সেকালের পণ্ডিতরা ধোকাবাজি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রমাণটা এই : উত্তমাশা অন্তরীপ অর্থাৎ আফ্রিকার একদম

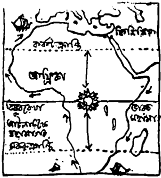

দক্ষিণের প্রান্ত বেড় দিয়ে পশ্চিমদিকে জাহাজ চালানোর সময়ে অভিযাত্রীরা দেখেছিল মধ্যদিনের সূর্য হেলে পড়েছে তাদের ডানদিকে।

কারাও কি বিশ্বাস করতেন

অভিযাত্রী ফিনিসিয়ানরাও কিন্তু কখনোই আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি যে ভূমধ্যসাগরে নাতিশীতোষ্ণ উত্তরাংশের

আকাশে সূর্যের অবস্থান যেখানে, মকরক্রান্তির দক্ষিণে দাঁড়ালে আকাশের সূর্যের অবস্থনে কখনোই সে জায়গায় থাকে না। স্বচক্ষে না দেখলে এরকম অসম্ভব প্রমাণকেও তারা বিশ্বাস করতে পারত না, আঁচ করা তো দূরের কথা। খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বছর আগে এই অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন মিশরের এক ফারাও—নেকো। মিশরের দক্ষিণ উপকূল থেকে লোহিত সমুদ্র বরাবর জাহাজ চালিয়ে মিশরের উত্তর উপকূলের আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌছোনোর সম্ভাবনা-স্বপ্নে মশগুল হয়ে ছিলেন ভদ্রলোক। এই দুইয়ের মাঝের মরুভূমির ওপর একটা খাল কেটে নিলেই ল্যাটা চুকে যেত—স্বপ্ন সম্ভব হত নেকো-র (২৪০০ বছর পরে ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্স সুয়েজ খাল নির্মাণ করে তা সম্ভব করেছিলেন)—কিন্তু অত খোঁড়া খুঁড়ির মধ্যে না গিয়ে নেকো ভাবলেন 'তার চাইতেও অনেক সোজা হবে জাহাজে চেপে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে মরক্কো পৌছোনো।

স্বপ্ন দেখলেই তো হল না, তাকে কাজে পরিণত করা চাই। এতখানি জলপথ জাহাজে পাড়ি দেওয়ার মত ডানপিটে সমুদ্র অভিযাত্রী তাঁর দেশে একজনও ছিল না। তাই তিনি একদল ফিনিসিয়ান নাবিককে টাকা দিয়ে এই কাজে লাগালেন —সেই সঙ্গে ভাড়া নিলেন তাদেরই পঞ্চাশ দাঁড়ের পাল তোলা জাহাজের ছোট একটা দল। হুকুম দিলেন লোহিত সাগর বরাবর গিয়ে আফ্রিকাকে বেড় দিয়ে জিব্রাল্টার অন্তরীপে পৌছোতে হবে। তখন অবশ জিব্রাল্টার অন্তরীপের নাম ছিল 'পিলারস অফ হারকিউলিস্'।

অজানার অভিযানে দাঁড় টেনে যাত্রা

ফিনিসিয়ানরা আনন্দে নেচে উঠল এহেন ভাড়া খাটার প্রস্তাবে। অনেকদিন ধরে তারাও এমন একটা পথ বার করবার স্বপ্ন দেখছিল যে পথে জাহাজ চালিয়ে পশ্চিম অঞ্চলে বাণিজ্য করে যেতে পারবে গ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্ত্রিত জলপথ না মাড়িয়ে। কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশটা আকারে কিরকম এবং আয়তনে কি বিপুল, সে ধারণা তাদেরও ছিল না—ফারাও নেকোরও ছিল না।

কোন্‌পথে অভিযাত্রীরা অজানা পথে পাড়ি জমিয়েছিল, তার একটা ছক আধুনিক পণ্ডিতরা নতুন করে বানিয়েছেন। ছকটা এই: নভেম্বরে রওনা হয় ফিনিসিয়ানরা, দাঁড় টেনে যায় আফ্রিকার পূর্ব প্রান্তের গার্ডাফুই অন্তরীপে; সেখান থেকে মৌসুমী বায়ুর তাড়নায় রওনা হয় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।

মাসের পর মাস এগিয়ে চলেছে সেইদিকে। যে অঞ্চলে আগে কেউ কখনো আসেনি—জাহাজ চালিয়ে চলে সেই দিকে। অনেক দূর এসেও কিন্তু দেখে যা ভেবে বেরিয়ে ছিল, হচ্ছে না। উপকূল পশ্চিমে মোড় নিয়ে উত্তরাভিমুখী হচ্ছে না—তাদেরও বাড়িমুখো যাত্রা সম্ভব হচ্ছেনা। দক্ষিণ দিকেই যেতে হচ্ছে মাসের পর মাস - নিরাশ হতে হচ্ছে প্রতি দিন, প্রতি মাস। আস্তে আস্তে হতাশায় ভেঙে পড়তে লাগল দুঃসাহসীরা।

সেই সঙ্গে দেখা দিল নতুন একটা উদ্বেগ। সভয়ে লক্ষ্য করল, সূর্যদেব আকাশ পথে একটু একটু করে হেলে পড়ছে উত্তর দিকে। নিশ্চয় 'কম্পাস' বিগড়েছে। নইলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কখনো ঘটে? চিরকাল তারা দেখছে সূর্য থাকে দক্ষিণের আকাশে—উত্তরের আকাশে যাবে কেন? অতএব 'কম্পাস' বিগড়েছে। তারপর যখন ধ্রুবতারাকেও আর দেখা গেল না—তখন বিশ্বাসটা আরো শেকড় গেড়ে বসল মাথার মধ্যে—'কম্পাস' অবশ্যই বিগড়েছে, কেননা, ধ্রুবতারাকে রোজ সারারাত এক জায়গাতেই দেখা যায়। ঠিক তার বরাবর নিচেই হল পৃথিবীর উত্তর মেরু। ইংরেজিতে তাই একে বলে Pole Star বা মেরুতারা। স্থান বদলায় না বলে বাংলায় বলে ধ্রুবতারা—যে স্থান বদলায় না, তাকে বলে ধ্রুব। সেই ধ্রুবতারাই যখন মিলিয়ে গেল আকাশ থেকে, তখন অভিযান শিকেয় তুলে আসার পথেই দেশে ফেরার কথা ভাবতে লাগল অভিযাত্রীরা—আর ঠিক সেই সময়ে উপকূল মোড় নিল পশ্চিম দিকে।

আফ্রিকার চ্যাপটা দক্ষিণ ডগার দৈর্ঘ্য পাঁচশ মাইল—এই পাঁচশ মাইল পথে দাঁড় টেনে জাহাজ নিয়ে গেল অভিযাত্রীরা। বেরিয়েছিল নভেম্বরে—পরের বছরের মে মাসে পেরিয়ে এল দক্ষিণ প্রান্ত—উত্তমাশা অন্তরীপকে বেড় দিয়ে মোড় ঘুরল উত্তর দিকে উপকূলও যে মোড়নিল উত্তর দিকে!

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অভিযাত্রীরা। সঙ্গে করে আনা গমের দানা মাটিতে পুঁতে দেওয়ার জন্যে জাহাজ থামালো কিছুদিনের

জন্যে। তারপর সেই গমের ফসল সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল ডিসেম্বর মাসে—প্রতিদিন দেখা গেল সূর্য আবার উঠে আসছে আকাশের ঠিক মধ্যের দিকে।

আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম অংশ বিরাট কুঁজের মত ঠেলে বেরিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। এই অংশটাকে বেড় দিতেই বেচারীদের লাগল কমসেকম দশ মাস। হিমসিম খেয়ে গেল ছোট্ট জাহাজের পুরো দলটা! তার পরেও বেশ কিছুদিন জিরেন নিতে হল মরক্কোর কোনো এক জায়গায় খাবার দাবার জোগাড় করে শূন্য ভাঁড়ার ভর্তি করার জন্যে। তারপর দেখতে পেল জিব্রাল্টার প্রণালীর বহু পরিচিত দৃশ্য।

লোহিত সমুদ্র থেকে নোঙর তোলার পর ১৬,০০০ মাইল জলপথে পাড়ি দিতে হয়েছিল দুঃসাহসী এই অভিযাত্রীদের। কি হয় কি হয় করে কেটে গিয়েছিল দু'বছরেরও বেশী সময়। তারপর এত কষ্ট, এত উদ্বেগ, এত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ভানপিটের দল হৈ হৈ করে বিজয় গৌরবে ফিরে এসেছিল ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে মিশরে। কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ কি জুটেছিল ভাগ্যে?

দু'হাজার বছর ব্যাপী টিটকিরি!

[আগামী সংখ্যায় "প্রশান্তর প্রভু"—দুঃসাহসী পলিনেশিয়ানরা কিভাবে শুধু স্পর্শ অনুভূতির সাহায্যে নৌচালনা করেছিল বিপুল মহাসমুদ্রে—এই সেই বিস্ময়কর কাহিনী]

ব্ল্যাক ট্র্যাকারের কাহিনী (৫৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বাবা ও মা একটা জ্বলন্ত আগুনের সামনে বসে সন্ত ঝলসানো এমুর মাংস খাচ্ছে চারিয়ে চারিয়ে।

অথচ আশ্চর্য এই ট্র্যাকার ছেলেটি প্রায় দশ বছর ধরে মাতা পিতাকে ছেড়ে এসেছে।

এই ধরনের অদ্ভুত স্মৃতি শক্তির আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায় টাউন্সভিল অঞ্চলে। সেখানে পাঁচজন বুনো আদিম অধিবাসী একটি পাঁচ বছরের জাপানী ছেলেকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। মাড়ে কিং নামক অদ্ভুত মেধার একটি ট্র্যাকার সেই পাঁচ খুনেকে বিস্ময়কর ভাবে খুঁজে বের করে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

যদিও খুনের পর পাঁচদিন কেটে গেছে, এবং সমুদ্রের জোয়ারের জল তীর ভূমিস্থ যাবতীয় পদচিহ্ন লোপ করে দিয়েছে, তবু অদ্ভুত এক ক্ষমতাবলে ট্র্যাকারটি পুলিসদলকে বালকের মৃত দেহের কাছে নিয়ে যায়। যেখানে একটা ঝোপের আড়ালে বালকের শব লুকোনো ছিল সেটা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হবার স্থান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত। বিভিন্ন চিহ্ন দেখে মাড়ে কিং এই হত্যাকাণ্ডের বিশদ বিবরণ গড়ে তোলে। সে জানায় কিভাবে অসহায় বেচারা জাপানী বালকটিকে দূর জঙ্গলে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

কাছাকাছি অঞ্চলে পদচিহ্ন সতর্কতার সঙ্গে দেখে দেখে ট্র্যাকার পাম আইল্যাণ্ডের পাঁচজন আদিম অধিবাসী মানুষের নাম বলে দেয় যারা এই নৃশংস হত্যায় লিপ্ত ছিল। পরে এইসব বুনো লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করে জেরা করায়, তারা সব অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যায়।

এই ব্ল্যাক ট্র্যাকাররা ঘন জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য নরনারী শিশুকে উদ্ধার করে তাদের প্রাণে বাঁচায়। শুধু পুলিসের কাজ নয় মানবিকতার কাজও এরা করে থাকে।

Best Compliments from :

M/s JUCO MACHINERY CORPORATION

14 GANESH CHANDRA AVENUE

CALCUTTA-700013

মুস্কিল আসান

—জরাসন্ধ

[কথায় বলে ভারবাহী গর্দভ। রজকের বোঝা বয়ে বেড়ানোই তার কা কিন্তু সেই গাধা দারোগাবাবু ও তাঁর ছেলের ঘাড়ে কিভাবে চেপে বসলো এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে বোঝা নামলো— রে, কিভাবে মুস্কিল আসান হল ?]

ভগেলু ধোপাকে সবাই চেনে। ধোলাই করার দাপটে নতুন জামা কাপড় ছিঁড়তে তার জুড়ি মেলা ভার। এ অঞ্চলের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—সদাই জোড়হস্ত! বেওসায় বহুত রূপেয়া কামাই করেছে এখন সব ফেলে রেখে তাকে মুলুক যেতে হবে—জরুরি চিঠি এসেছে! পোটলা পুটলি বেঁধে তার প্রিয় গাধার পিঠে চাপিয়ে ডেরা ছেড়ে ইস্টিসানে হাজির। মাস্টার মশায়ের কথা শুনে ভগেলুর চোখ কপালে উঠলো তার সাধের গাধা 'বাচুয়া'-কে সঙ্গে নিয়ে যেতে হলে, গাধার জন্যে, 'মাশুল' লাগবে তের টাকা সাড়ে পাচ আনা ?

অতো টাকা খরচ করে তো গাধা নিয়ে যাওয়া যায় না! উপায় কী? হঠাৎ তার মনে পড়লো পাড়ার নগেনবাবু ওরফে নগেশদার কথা। নিঃসন্দেহে কৃতী পুরুষ—মহাপুরুষও বলা যায়। একনাগাড়ে পরীক্ষায় ফেল করে চলেছেন। তিন বছর ধরে ফার্স্ট ক্লাশের বেঞ্চি দখল করে আসছেন—মনে কোন বিকার নেই! প্রবীণ অভিজ্ঞ ছাত্র হিসেবে তিনি স্কুলের সব ছাত্রের গার্জেন। ভগেলু তার সমস্যা ও বিপদের কথা বলতেই নগেশদা আশ্বাস দেয়—ডরো মৎ। সব ঠিক হো জায়গা। …পরদিন সকালে নগেশদা চেলাদের পাঠিয়ে লোক জড়ো করেছে—নীলামে গাধা বিক্রি হবে। যথারীতি নিলেম-ও হলো। নীলাম ডেকে সর্বোচ্চ দামে—নগদ তিন টাকা চার আনায় নগেশদা গাধাটা কিনে নিলেন। ভগেলু খুশী। ঝাড়া হাত-পা হয়ে, নগদ টাকাটা পকেটে গুঁজে সে মুলুক যাত্রা করলো। সবাই ভাবছে—নগেনদার এই অহেতুক গর্দভ প্রীতির পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে?

বোঝা বওয়া গর্দভের বোঝা বয়ে বেড়াবার ছেলে নগেশদা নয়! বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে হবে। নিজের গাঁট থেকে খরচ করা পয়সার অন্ততঃ চার-পাঁচ গুণ উশুল করতে হবে। …পরের দিন শহরের সর্বত্র হাতে-লেখা পোস্টারে ছেয়ে গেল—"লটারী করে গাধা বিক্রি করা হবে। টিকিট মাত্র এক আনা!" নগেশদা নিজেই লটারির টিকিট বিক্রি করছে—ইস্কুলের ছেলেরা বাধ্য হয়ে কিনছে। ক্লাসের সেরা ছাত্র, ফার্স্ট বয় দারোগাবাবুর ছেলে, অজয় সেন-ও রেহাই পেল না।

সোহিনী মানেই ভালো বই

প্রকাশিত হচ্ছে :

ছোটদের জন্য মন মাতানো ছড়া
আর সেই সঙ্গে পাতায় পাতায় ছবি

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের

ফুলঝুরি

৫'০০

ছড়া তো নয় যেন ছড়ানো সোনা !
সাড়া-জাগানো ছবি ও প্রচ্ছদ
এঁকেছেন : সুনীল শীল

সোহিনী প্রকাশনী
২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড। কলকাতা ৭০০০০১

প্রকাশিত হলো :

ছোটদের মনের মতো বই দেশবিদেশের উপকথা ॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের

ভিনদেশী উপকথা

৫'০০

গল্পে ছবিতে জমজমাট
যা তোমাদের কাড়াকাড়ি করে
পড়তেই হবে

বুক ট্রাস্ট। ৩০/১বি কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে :

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ

পাখি জানে

'০০

প্রচ্ছদ / রঘুনাথ গোস্বামী

সোহিনী প্রকাশনী
২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড। কলকাতা ৭০০০০১

---

48 2692

With best compliments from :

HANSRAJ B. MANSATA

SCREEN PRINTERS

11D MANOHAR PUKUR ROAD
CALCUTTA-26

বেচারা অজয় জানেনা তার কপালে কি দুর্ভোগ ঘনিয়ে আসছে। তিনদিন পরে খেলার মাঠে লটারি হ'ল। থার্ডমাস্টার জগৎবাবুর তিন বছরের ছেলে মিণ্টু, একটা বড়ো টিনের কৌটায় রাখা টিকিটগুলো থেকে একটা মোড়ক তুলে নিল। এই মোড়কগুলোই লটারির টিকিট। ক্রেতাদের নাম লেখা আছে প্রত্যেক টিকিটে!

কে জিতলো? কে জিতলো? সন্দেহের নিরসন করলেন জগৎবাবু নিজেই। মোড়ক খুলে উচ্চৈঃস্বরে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করলেন 'অজয় সেন।' ...বন্ধুরা দল বেঁধে ছুটলো অজয়কে 'সুখবরটা' দিতে। অজয় পড়ার ঘরে বসে এগজামিনের পড়া তৈরি করছিল।...এই 'দুঃসংবাদ' শুনে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললো।

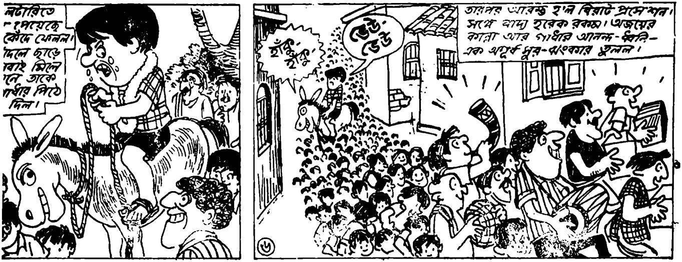

কিন্তু বন্ধুরা ছাড়'ব কেন ? অজয়কে ধরে নিয়ে এলো খেলার মাঠে—যেখানে গাধাটা বাঁধা আছে ! তারপর অজয়কে গাধার পিঠে চড়িয়ে, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল আরও অনেক রকম বাজনা বাজিয়ে প্রসেশন করে ছেলের দল এগিয়ে চললো অজয়ের বাড়ির দিকে। বাজনার সঙ্গে অজয়ের ভেউ ভেউ কান্না, আর গাধার সরব হর্ষধ্বনি 'হাকু, হাকু' মিলে এক বিচিত্র ঐক্যতানের সৃষ্টি হলো !

সারা সহর প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যার সময় শোভাযাত্রা এসে থামলো থানার সামনে। 'নাটের গুরু' শোভাযাত্রার লীডার নগেশদা অজয়ের হাতে বাছুয়ার গলার দড়ি ধরিয়ে দিতেই, অজয় প্রতিবাদ করে—সব জোচ্চুরি, তার বাপকে বলে দেবে। নগেশদা সাবধান করে দেয়— গাধাটাকে যেন বেঁধে রাখে অজয়। নইলে খোঁয়াড়ে গেলে খেসারত দিতে হ'বে।

থানার একজন সিপাই বুদ্ধি করে গাধাটাকে রাতের মতন একটা ফাঁকা হাজত ঘরে আটকে রাখলো। এদিকে ভোর না হতেই পুলিস সাহেবের লঞ্চ থানার ঘাটে ভিড়েছে—সবাই ব্যস্ত, গাধাটার কথা কারুর খেয়াল নেই। 'বাচ্চুয়ার' খিদে পেয়েছে, চুপ করে থাকবে কেন? বেলা দশটা নাগাদ পুলিস সাহেব অফিসে বসে কাগজপত্র দেখছেন 'বাচ্চুয়া' 'মিঠে স্বরে' তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল হাঁকু, হাঁকু!

পুলিস সাহেব হাজতে গাধা দেখে চমকে উঠে অজয়ের বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন—এটা কোন্ মোকদ্দমার আসামী? দারোগাবাবু কিছুই জানেন না। চট্ করে সামলে নিয়ে বলেন, পরের জমিতে ঢুকে ধান খেয়েছে—ট্রেসপাস আর চুরির অভিযোগ। চালান করে দেবো।…

পুলিস সাহেব চলে যেতেই ক্রুদ্ধ দারোগাবাবু (অজয়ের বাবা) দুই সিপাই—গন্ধমাদন পাঁড়ে আর কিষ্কিন্ধ্যা সিং-কে ডাকলেন —গাধাটা তাঁর ছেলে অজয়ের শুনে তারও ডাক পড়লো অজয় ভয়ে ভয়ে লটারি, গাধা জেতা– সব খুলে বলে। দারোগাবাবু রেগে টং– সবাইকে ২৯৫.ধারায় চালান করবেন। সিপাইদের ওপর হুকুম হলো– গাধাটাকে 'পিঠমে ডাণ্ডা মারকে আভি নিকাল দেও !'

সিপাই গন্ধমাদন পাড়ে ডাণ্ডা হাতে তাড়া করতেই 'বাচুয়া' চার ঠ্যাঙ তুলে পগার্‌পার।—দিন সাতেক পরের কথা। দারোগাবাবু মফঃস্বলে যাবেন, ঘোড়ায় উঠতে যাবেন– ইউনিয়ন বোর্ডের এক চাপরাশী গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল। খোঁয়াড়ে ছিল, দারোগাবাবুর জিনিস তাই চাপরাশী নিজেই নিয়ে এসেছে। দারোগাবাবুর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল।

বাগজটা হল খোঁয়াড়ের বিল—সাত টাকা সাড়ে এগার আনা। চাপরাশী বলে খোকাবাবুর গাধা। মাত্র চার পয়সায় কিনেছেন। বরাত ভালো। দারোগাবাবু রেগে মেগে চাপরাশীকে তাড়া করলেন। কিন্তু টাকাটা দিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত—সরকারী খোঁয়াড় তো?

টাকার শোক ছাড়া অপদস্ত হওয়ার ঘটনায় দারোগাবাবু ছেলের ওপর রেগে আগুন হয়ে আছেন। অজয়কে ডেকে একেবারে চরমপত্র (আলটিমেটাম) দিয়ে বলেছেন—তিন দিনের মধ্যে যদি গাধাটাকে বিদেয় না করো হাড়-মাস আলাদা করে দেবো! —বেচারা অজয় বাচ্চুয়া অজয়ের বেজায় ন্যাওটো হয়ে পড়েছে—তাকে দেখতে না পেলেই চিৎকার জুড়ে দেয়। কি করে ওটাকে পাচার করা যায় ভাবতে ভাবতে অজয় বলে ওঠে- 'ইউরেকা!' ...উপায় পেয়ে গেছে।

'বাচুয়া' মাঠে বাঁধা ছিল। অন্ধকার রাত, চাঁদের আলো নেই। গাধার দড়িটা হাতে নিয়ে চার মাইল হেঁটে অজয় কেষ্টপুর পৌঁছাল গভীর রাতে। এখানে ধোপাদের একটা 'কলোনী' আছে, গাধাগুলো বাইরে ছাড়া আছে। তাদের দলে 'বাচুয়া'-কে ভিড়িয়ে দিয়ে অজয় বাড়ির পথে দৌড় দিল!

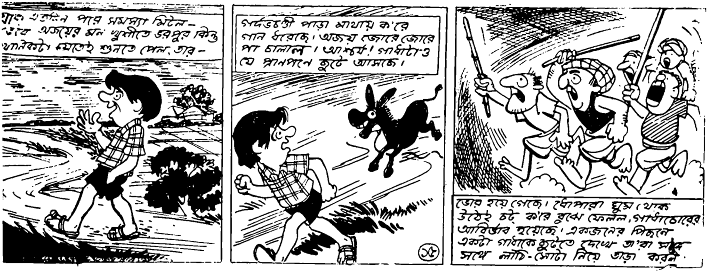

গর্দভ-সমস্যার সমাধান করতে পেরে অজয় খুশী মনে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ির দিকে চলেছে। বাচুয়া যে তার পিছন পিছন আসছে জানতে পারেনি সে। মনিব চলে যাচ্ছে দেখে বাচুয়া তার পিছু নিয়েছে, সেও তান ধরেছে— হাঁকু, হাঁকু। অজয় ছুটছে, বাচুয়াও ছুটছে তার পিছনে। ভোর হয়েছে, ধোপারা হাঁক ডাকে উঠে পড়েছে। অজয়ের পেছন পেছন বাচুয়াকে ছুটতে দেখে তারা ভাবে গাধা-চোর গাধা চুরি করে পালাচ্ছে। লাঠি-সোটা নিয়ে তারা অজয়কে তাড়া করে।

দৌড়ের পাল্লায় অজয় হেরে গেল। ধোপারা তাকে পাকড়াও করে দু'একটা চড়-চাপড় কষালো। অজয় যে গাধা-চুরি করতে আসেনি, বরং একটা গাধা দান করতে এসেছিল, একথা কে বিশ্বাস করবে?

অজয় নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে ধোপারা বেশী 'হাতের সুখ' করতে পারলো না। অজয়ের হাতে কোমরে দড়ি বেঁধে বামাল সমেত থানায় এনে হাজির করলো তাকে। দারোগাবাবু বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। ছেলেকে ওই অবস্থায় দেখে লাফিয়ে উঠলেন। চেয়ার উলটোলো। টেবিলটা ছিটকে গিয়ে পড়লো উঠানে শুয়ে থাকা একটা কুকুরের ঘাড়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে প্রতিবাদ জানিয়ে কুকুরটা দুর্জন-সংসর্গ ছেড়ে স্থানত্যাগ করলো!

অজয়ের ওই দুরবস্থা। ধোপাদের সঙ্গে সেই গাধা দেখে দারোগাবাবুর মেজাজ সপ্তমে উঠেছে। হাঁক পেড়ে দুই সিপাই—কিষ্কিন্ধ্যা আর গন্ধমাদনকে বলছেন—নিকাল দো, নিকাল দেও! ধোপারা সবিনয়ে জানায় বামাল সমেত তারা গাধা-চোরকে ধরে বেঁধে এনেছে হুজুর বিচার করুন!

ব্যাপার-স্যাপার দেখে দারোগাবাবুর মাথাটা ঘুলিয়ে গেল। অজয়কে আলাদা ডেকে সব কথা শুনে মাথা ঠাণ্ডা হ'ল। ধোপাদের বলে দিলেন—তারা তাদের গাধাটা নিয়ে যাক্। গাধা-চোর দারোগাবাবুর জিম্মায় থাকলো। ধোপারা গাধা নিয়ে চলে যেতে দারোগাবাবু হাঁক ছাড়লেন—এতো সহজে ঘাড় থেকে গাধার বোঝা নেমে যাবে, মুস্কিল আসান হবে ভাবতে পারেন নি তিনি। ছেলটার বুদ্ধি আছে। তখনই গন্ধমাদন পাড়েকে হুকুম দিলেন—খোকাবাবুকে এক রুপেয়াকা রসগুল্লা, আউর দোঠো লিমনেড খিলা দো!

। শেষ ।

মনে রেখো

সোহিনী পাল

সাধারণ বিষয়

১। প্রঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাদুঘর কোথায় ?

উত্তর—আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের আমেরিকান মিউজিয়ম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি। সব মিলিয়ে উনিশটি বাড়িতে এই জাদুঘরটি অবস্থিত। সমগ্র আয়তন প্রায় ১৩,০০০ বর্গ মিটার।

২। প্রঃ পৃথিবীর উচ্চতম মূর্তি কোনটি ?

উত্তর—সোভিয়েত রাশিয়ার হোমেং পর্বতে অবস্থিত 'মাতৃভূমি' মূর্তি, উচ্চতা 82·35m (270 ফুট)।

৩। প্রঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গ্রন্থাগারের নামকরণ কার স্মৃতিতে করা হয়েছে ?

উত্তর—প্রয়াত দাগ হ্যামার সোয়েল্ড এর নামে।

৪। প্রঃ কোন্ দেশ থেকে, কোন্ বৎসরের সর্ব প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উত্তর—১৯০১ সালে, সুইডেন থেকে।

৫। প্রঃ পৃথিবীর সবথেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন মাছের নাম কি ?

উত্তর—আটলান্টিক শেল ফিশ্, গতিবেগ ঘন্টায় 78·80 কি মি।

সাহিত্য

৬। প্রঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কবিতার নাম কি ?

উত্তর—মহাভারত, শব্দের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ।

৭। প্রঃ সিসিল ডে লুইস কে ছিলেন ?

উত্তর—'ব্রিটিশ রাজ কবি।

৮। প্রঃ সনেটে কয়টি পংক্তি থাকে ?

উত্তর—১৪ টি।

৯। প্রঃ 'ইসাবেল' কবিতাটি কে লিখেছিলেন ?

উত্তর—জন কীটস।

১০। প্রঃ বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের আসল নাম কি ?

উত্তর—স্যামুয়েল ল্যাংহোম ক্লীমেন্স।

প্রথম বাঙালী পুরুষ

১১। প্রঃ তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারক কে ?

উঃ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

১২। প্রঃ প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ কে ছিলেন ?

উঃ কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।

১৩। প্রঃ প্রথম আই. সি. এস. কে হন ?

উঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বভারতেও প্রথম সিভিলিয়ান।

১৪। প্রঃ আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী কে ?

উঃ সার অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৫। প্রঃ প্রথম 'নাইট' উপাধিতে কে ভূষিত হন ?

উঃ শ্রী চন্দ্র মাধব ঘোষ। ('সার' উপাধি)

১৬। প্রঃ মিলিটারী ক্রশ পাইয়াছিলেন কে ?

উঃ কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়। (ব্রিটিশ শাসনের আমলে যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও কৃতিত্বের জন্য এই সামরিক পদক দেওয়া হ'ত। সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান হল 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ')।

১৭। প্রঃ সর্বপ্রথম প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য কে হন ?

উঃ সার বি. সি. মিত্র। (ব্রিটিশ শাসনের আমলে সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল প্রিভি কাউন্সিল। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট। প্রিভি কাউন্সিলের অধিবেশন হ'ত ইংলণ্ডে)।

M/s DAYAL INDUSTRIES

242/H Acharya Prafulla Chandra Road

CALCUTTA 4

Phone No 54 2383

পড়াশোনায় মন নেই ?

স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না ?

কিংবা

কোনও স্বপ্ন সফল হচ্ছে না ?

তাহলে আর দেরী না করে এখনই যোগাযোগ করো :

হাওড়ার একমাত্র প্রাচীন জান পণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ জ্যোতিঃশাস্ত্রী হাওড়া—জানবাড়ী, হাওড়া হইতে ৫২, ৫৮ বাসে জানবাড়ী স্টপেজ।

ফোন : ৬৭·৩৪৯৭। সাক্ষাতের সময় বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা।

প্রকাশক

ভক্তবৃন্দ

১৮। প্রঃ প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন কে কে ?

উঃ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

১৯। প্রঃ সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছিলেন ?

উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম বাঙালী মহিলা

২০। প্রঃ প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কারা ?

উঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু।

২১। প্রঃ মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে এম. এ. হন ?

উঃ চন্দ্রমুখী বসু।

২২। প্রঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সদস্য কে ?

উঃ স্বর্ণ কুমারী দেবী।

২৩। প্রঃ সর্বপ্রথম কোন্ বাঙালী মহিলা ইংরেজী কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন ?

উঃ সরোজিনী নাইডু।

২৪। প্রঃ প্রথম মহিলা রাজ্যপাল কে ?

উঃ সরোজিনী নাইডু।

২৫। প্রঃ সবচেয়ে কমবয়সে ম্যাট্রিক পাস ও গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন কে ?

উঃ বাণী ঘোষ।—১০ বছর ৭ মাস বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং ১৪ বছর বয়সে বি. এ. পাস করে গ্র্যাজুয়েট হন।

(এই সময় ম্যাট্রিক পাস করার ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর ধার্য হয় নি)।

২৬। প্রঃ প্রথম পাইলট কোন মহিলা ?

উঃ শ্রীমতী দুর্গা বন্দোপাধ্যায়।

ভূগোল

২০। প্রঃ প্রশান্ত মহাসাগরে গভীরতম স্থানের নাম কি ?

উঃ ম্যারিনাস ট্রেঞ্চ, 10,900 মি গভীর। 1959 সালে নূতন পরীক্ষায় এটির গভীরতা 11033 মি বলে নির্ণীত হয়েছে।

২১। প্রঃ পৃথিবীতে কোন সহরের উচ্চতা সবচেয়ে বেশী ?

উঃ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 5100 মি (16,732 ফুট) উঁচুতে অবস্থিত ওয়েন চুয়ান। 1955 সালে ক্লিংথাই-তিব্বত সড়কের উপর এটি স্থাপন করা হয়।

২২। প্রঃ 'দন্ত মন্দির' কোথায় অবস্থিত ?

উঃ শ্রীলংকায়, কাণ্ডী সহরে।

২৩। প্রঃ কোন দেশকে নিশীথসূর্যের দেশ বলা হয়, এবং কেন ?

উঃ নরওয়েকে, কারণ পৃথিবীর অক্ষ তার বার্ষিক গতির সমতলের সংগে তির্যক ভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে উত্তর মেরুবৃত্তে অবস্থিত দেশগুলিতে একসংগে কয়েক মাস ধরে দিনের আলো থাকে।

২৪। প্রঃ অস্ট্রেলিয়াতে সবচেয়ে গরম মাস কি কি ?

উঃ ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে অস্ট্রেলিয়াতে সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে।

ইতিহাস

২৫। প্রঃ মিশরে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার কোন সহর স্থাপন করেছিলেন ?

উঃ আলেকজাণ্ড্রিয়া।

২৬। প্রঃ কাকে 'লিটল কর্পোরাল' বলে ডাকা হত ?

উঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

২৭। প্রঃ 1911 সালে চীন সাধারণতন্ত্র কে স্থাপন করেন ?

উঃ ডঃ সান ইয়াট সেন।

২৮। প্রঃ প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কত সালে সুরু হয়েছিল ?

উঃ 1857 সালে, ব্রিটিশরা এই যুদ্ধকে ভারতীয় সিপাই বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছিল।

২৯ প্রঃ মহাভারতের যুদ্ধ কতদিন চলেছিল ?

উঃ আঠার দিন।

বিজ্ঞান

৩০। প্রঃ কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 1972 সালে পদ্মবিভূষণ উপাধি পেয়েছিলেন ?

উঃ ডঃ বিক্রম সারাভাই।

৩১। প্রঃ কোন অবস্থায় একটুকরো পাথর আর একটা পাখীর পালক সমান গতিতে পড়ে ?

উঃ বায়ুশূন্য স্থানে।

চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়ম

১। চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ বিজ্ঞানসুবাসিত, রহস্য, কল্পনারঙীন, অ্যাডভেঞ্চার, গল্পকল্প, কার্টুন তথ্যের মাসিক পত্রিকা। সুতরাং এতে সায়ান্স-ফিকশন, ক্যানটাসি ধরনের গল্প, উপন্যাস, খবরাখবর, কার্টুন, নাটক ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। লেখক ও শিল্পীরা কেবলমাত্র সেই ধরনের জিনিসই পাঠাবেন। ছোট গল্পের প্রয়োজনই বেশী।

২। ছোট গল্প ৫০০ শব্দ এবং ছোট উপন্যাস ৩০০০ শব্দের মধ্যে মোটামুটি) হওয়া চাই।

৩। প্রত্যেক লেখা ইত্যাদির সঙ্গে ঠিকানা-লেখা পোস্টকার্ড থাকা চাই।

৪। বিদেশী ছায়া অবলম্বনে বা অনুবাদ করলে তার বিশদ উল্লেখ অবশ্যই করা দরকার।

৫ গল্প ইত্যাদির নীচে লেখকের নাম ঠিকানা থাকা চাই।

৬। অবশ্যই নিজের কাছে লেখার একটি কপি রেখে পাঠাবেন। প্রকাশের জন্যে কপিটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখা দরকার।

৭। প্রাপ্ত লেখা ইত্যাদি সযত্নে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার কোন দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে লেখা ফেরৎ দেওয়া হয়।

৮। মনোনীত হলেও লেখা ইত্যাদি প্রকাশ হতে যথেষ্ট দেরী হতে পারে; সেজন্য তাগিদ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম ও সুযোগ

বার্ষিক চাঁদা ৪৫ টাকা অগ্রিম মনিঅর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ব্যাঙ্কড্রাফট বা ক্রশ চেকে পাঠাবেন। "SOHINI PROKASHANI" নামে। কলকতার বাইরের চেক নেওয়া হয় না।

গ্রাহকদের ভিপিতে পত্রিকা না নেওয়াই ভালো—খরচ বেশী পড়ে, টাকা নিয়ে গোলমাল হয় পোস্ট অপিসে।

রেজিস্টার্ড ডাকে পত্রিকা নিতে হলে বছরে ১৫ বেশী লাগে। অফিস থেকে হাতে করে পত্রিকা নিতে হলে সেকথা আগে জানিয়ে দিতে হয় এবং প্রতি ইংরেজী মাসের ২০ তারিখ নাগাদ চাঁদার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করতে হয়।

৪। ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে লিখিতভাবে P. M. G., W. B. Circle, Calcutta-1 ঠিকানায় অভিযোগপত্র পাঠিয়ে তার অনুলিপি পত্রিকা অফিসে পাঠাবেন। তাহলে আর এক কপি পত্রিকা দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

৫। গ্রাহক হলে বিশেষ সংখ্যা, পূজা সংখ্যা, বড়দিন সংখ্যা, প্রভৃতির জন্য বেশী দাম দিতে হয় না।

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

১। চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ পত্রিকার এজেন্ট হতে হলে ১০ টাকা জমা রাখতে হয়। এক মাস আগে জানিয়ে এজেন্সী ছাড়লে ঐ টাকা ফেরত পাওয়া যায়।

২। কমপক্ষে ৫ কপি প্রতি সংখ্যা নিতে হয়।

৩। টাকায় ২৫ পয়সা কমিশন দেওয়া হয়।

৪। ভিপিতে পত্রিকা পাঠানো হয়; ভিপি খরচ বহন করা হয়।

৫। ভিপি প্রত্যাখ্যান করলে এজেন্সী জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করে এজেন্সী বাতিল করা হয়।

শুভ দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন

মহালক্ষ্মী ইনভেস্টমেণ্টস্

অথরাইজড ডিষ্ট্রিবিউটর্স

ক্রমটন গ্রীভস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ফোরমোস্ট ডেয়ারীস লিমিটেড

ইনডোডান ডেয়ারী প্রোডাক্টস লিমিটেড

প্রিয়লতা মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (রামগড়)

— রেজিস্টার্ড অফিস

৮/২৯৮, যোধপুর পার্ক

কলিকাতা-৬৮

Regd. No. R. N. 32660/77 CHILDREN'S DETECTIVE Rs. 2/-
N/DECEMBER '80 WB/SC 135

SOHINI PRAKASHANI, Phone 22-2770
Editor, Printer & Publisher—M. Bose from 26, Strand Road, Cal-1
Printed at Jayasree Press, Calcutta-
Cover Printed by New Gaya Art Press, Cal-9.